ভূতের গল্প

লীলা মজুমদার

ভূতের গল্প

সূচীপত্র

খাপায় নমঃ
পেনেটিতে
আহিরিটোলার বাড়ি
ভুতুড়ে গল্প
সত্যি নয়
যুগান্তর
পাশের বাড়ি
ঘামুকাকার বিপত্তি
স্পাই
নটরাজ
কর্তাদাদার কেরদানি
আকাশ পিদ্দিম
চেতলায়
পিলখানা
গোলাবাড়ির সার্কিট হাউস
অশরীরী
তেপান্তরের পারের বাড়ি
হানাবাড়ি

খাগায় নমঃ

ছোটবেলায় এই দোল-টোলের সময়, দেশে যেতাম, আমার ছোট-ঠাকুরদা আমাদের যত রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প বলতেন, সে-সব একবার শুনলে আর ভোলা যায় না। একদিন বললেন, "দেখ্, এই যে আমাদের গুষ্ঠির ধন-দৌলত দেখে গাঁ-সুদ্ধ লোকের চোখ টাটায়, এ কি আর একদিনে হয়েছিল ভেবেছিস, না কি চিরকাল এমনটি ছিল? বুঝলি এ-সব লেখাপড়া শিখে, সারা জীবন খেটেখুটেও কেউ করে দিয়ে যায় নি, বা লটারিতেও জেতে নি। কি শ্বশুরের কাছ থেকেও পায় নি। মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তেও কেউ ঘড়া-ঘড়া সোনা পায় নি, চুরিও করে নি, ডাকাতিও করে নি। তবে হল কি করে? আরে, ও-সব করে কি আর সত্যি-সত্যি ভাগ্য ফেরে? এই আমাকেই দেখ্ না, তিন-তিনটি বার ম্যাট্রিক ফেল করে সেই নাগাদ দিব্যি বাড়িতে বসে আছি। কিন্তু তাই বলে কি আর আমি তাদের কারু চাইতে মন্দ, না কি তাদের চাইতে কম খাই? তোরাই বল না। এই দেখ, এরকম হীরের আংটি দেখেছিস কখনো? এটার দাম কম সে-কম একটি হাজার টাকা। কখনো ভেবেছিস এত সব হল কোত্থেকে? এই যে দু-বেলা তাল তাল মাছ মাংস দই ক্ষীর তোরা পাঁচজনা ওড়াচ্ছিস, তাই-বা আসে কোত্থেকে? জানিস, এ-সমস্তরই একমাত্র কারণ হল গিয়ে একটা এই এত বড় কালো পালক।"

শুনে আমরা তো হাঁ। ছোটঠাকুরদা আরো বললেন—

"হ্যাঁ, একটা কালো পালক ছাড়া আর কিছুই নয়। ওটিকে তোরা না-দেখে থাকতে পারিস, কিই-বা দেখছিস দুনিয়াতে, ভূত পর্যন্ত

দেখিস নি। তবে ওটি কর্পুর-টর্পুর দিয়ে লাল সালুতে মোড়া হয়ে, একটা চন্দন কাঠের বাক্সে ক'রে আমার ঠাকুমার লোহার সিন্দুকে গোরা আছে।

"তোদের মতো আকাট মুখ্যুদের কিই-বা বলব, তবে শোন ব্যাপারটা গোড়া থেকে। আমার ঠাকুরদা ভারি চালাক-চতুর কায়দা-দুরস্ত মানুষ ছিলেন। ক্যায়সা তার চুলের টেরি বাগাবার ঢঙ, ক্যায়সা কোঁচানো মলমলি ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, কানের পিছনে তুলোর পুঁটলি করে আতর গোঁজা। সে-সব একবার দেখলেই লোকের তাক লেগে যেত। তার উপর আবার লোককে খুশি করতে তাঁর জোড়া খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। বুঝতেই পারছিস এই-সব কারণে এখানকার যিনি রাজা ছিলেন তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদার ভারি দহরম-মহরম ছিল। সেইজন্য রাজসভাতেও তাঁর বেজায় খাতির, আর তাই দেখে পাঁচজনার হিংসে!

"এক-এক দিন সকালে স্নান সেরে সেজে-গুজে ঠাকুরদা রান্নাঘরের পাশের ঐ গন্ধরাজ গাছটি—ওটির কি কম বয়স ভেবেছিস? —ঐ গাছটা থেকে দুটো ফুল পেড়ে নিয়ে রাজসভায় গিয়ে হাজির হতেন। আর সটাং গিয়ে রাজার কানে-কানে কি যে না বলতেন তার ঠিকানা নেই। ব্যস্, রাজাও আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাতের কাছে যা পেতেন, শাল-দোশালা—শিরোপা, জামা, জুতো, সব তাঁকে উপহার দিয়ে বসে থাকতেন!

"এমন-কি, শেষটা এমনি অবস্থা দাঁড়াল যে, দূর থেকে তাঁকে সভায় ঢুকতে দেখেই সভাসদ যত উজির নাজিররা যে-যার গয়নাগাটি, জুতো, পাগড়ি লুকিয়ে ফেলতেন। এমনি সব ছোট মন ছিল! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস যে এঁরা কেউই ঠাকুরদা বেচারিকে সুনজরে দেখতেন না। সত্যি কথা বলতে কি সব্বাই তাঁর উপর হাড়ে চটা ছিলেন, এমন-কি, একা পেলে তাঁকে খোসামুদে বলে অপমান করতেও ছাড়তেন না। অবিশ্যি তাতে আমার ঠাকুরদার কাঁচকলাও এসে যেত না, তিনি দিব্যি আদরে-গোবরে রাজার কাছে দিন কাটাতেন।

"এখন মুশকিল হল যে মানুষের কখনো চিরদিন একভাবে যায় না। তোরাই কি আর সারাটা জীবন ঐরকম কাজকম্ম না করে পরের ঘাড়ে দিব্যি চেপে কাটাতে পারবি ভেবেছিস? ঠাকুরদা বেচারি খাসা নিশ্চিন্তে

রাজসভায় মৌরসি পাট্টা গেড়ে জেঁকে বসেছেন। রাজবাড়ি থেকে রোজ তাঁর জন্যে কলসি-কলসি দুধ, ঘি, ভাঁড়-ভাঁড় দই ক্ষীর, ধামা-ধামা চাল-কলা, থোক থোক নতুন গরদ, তোড়া-তোড়া মোহর যায়। তাঁর আবার ভাবনা কিসের?

"এমনি সময় হঠাৎ একদিন কোত্থেকে এক ছোকরা কবি, বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে রাজসভায় এসে হাজির। কেউ তাকে কস্মিনকালেও চোখে তো দেখে নি, নাম পর্যন্ত শোনে নি। কিন্তু যেমনি তার রূপ, তেমনি তার খোসামুদে স্বভাব; দুদিনের মধ্যে রাজ্যসুদ্ধু রাজসভাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলল।

"কী আর বলব তোদের। তার উপর তার খাসা গানের গলা ছিল, আর কত যে ছলচাতুরি জানত। যখন-তখন যেমন-তেমন করে দুটো ছড়া গেঁথে নিয়ে গুব্‌গুবাগুব্ না বাজিয়ে, বাউলদের মতো করে এমনি নেচে-কুঁদে দিত যে সভাসুদ্ধু সব্বাই একেবারে গলে জল।

"ওদিকে ঠাকুরদা পড়ে গেলেন মুশকিলে। রাজা আর তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না। রাজবাড়ি থেকে রসদের লাইনও বন্ধ। এমনিতেই রাজ্যের লোককে চটিয়ে রেখেছেন। আর বছরের পর বছর বসে বসে এটা-ওটা খেয়ে দারুণ কুঁড়েও হয়ে গেছেন, তায় আবার দিব্যি টইটম্বুর একটি নাহাপাতিয়াও বাগিয়েছেন। অন্য জায়গায় কাজকর্মের জন্য যে একটু চেষ্টাচরিত্তির করবেন তারও জো নেই। অথচ মনে-মনে বেশ বুঝছেন যে এবার এখানকার পাট উঠল, ঐ ছোকরার সঙ্গে পেরে ওঠা, শুধু তাঁর কেন, তাঁর চোদ্দোপুরুষের কারো কম্ম নয়।

"আস্তে আস্তে ঠাকুরদার জীবন থেকে সুখ-শান্তি বিদায় নিল।— এই, তোরা যে বড় হাসছিস? নিজের অতিবৃদ্ধ-ঠাকুরদার দুর্গতির কথা শুনলে তোদের হাসি পায়? আরো শোন্ তবে। মানুষের অবস্থা মন্দ হলে যেমন হয়, ভোর না-হতেই—গয়লা রে, মুদি রে, তাঁতি রে, নাপিত রে, ধোপা রে, যে যেখানে ছিল সব টাকা দাও টাকা দাও করে সারি সারি হাত পেতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

"ওদিকে দিনে-দিনে অভাবে অনটনে ঠাকুমার মেজাজও এমনি খিঁচড়ে যেতে লাগল যে বাড়িতে টেঁকাও দায় হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত একদিন গভীর রাতে ঠাকুরদা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন। গভীর রাতে পা টিপে-টিপে বাড়ি থেকে না বেরিয়ে একেবারে সটাং গিয়ে এই গ্রামের

বাইরে মাঠের মাঝখানে যে বিখ্যাত ভুতুড়ে বটগাছ ছিল, দিনের বেলাতেও যার ছায়া মাড়াতে লোকে ভয় পেত—ইদিক-উদিক কি তাকাচ্ছিস বল দিকিনি? সে গাছ কোনকালে মরে-ঝরে চ্যালাকাঠ হয়ে গেছে। এখন চুপ করে শোন্ তো।—সেই গাছতলাতে না গিয়ে, এক হাঁড়ি শুঁটকিমাছ নিবেদন করে দিয়ে ঠাকুরদা ধর্না দিয়ে পড়ে থাকলেন। একটা যা-হয় ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত উঠবেন না।

"পড়ে আছেন তো পড়েই আছেন। প্যাঁচা-ট্যাঁচা ডাকছে, কিসের একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে, কি সব সড়্সড়্ খড়্খড়্ করে পায়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কারা জানি চাপা গলায় ফিস্-ফিস্ করছে, কিন্তু ঠাকুরদা নড়েনও না চড়েনও না।

"হয়তো-বা একটু তন্দ্রামতো এসে থাকবে, হঠাৎ মনে হল কে যেন বলছে, 'ওঠ্ ব্যাটা, বাড়ি যা। যা যা বাড়ি যা, আর তোর কোনোও চিন্তা নেই। ওঠ্ বলছি। কেটে পড় দিকিনি। কি জ্বালা। ভাগ বলছি।'

"ঠাকুরদাও তখনই আর কালবিলম্ব না করে, উঠে পড়ে বাড়িমুখো হাঁটা দিলেন। আর, কি আশ্চর্য ব্যাপার! একেবারে দোরগোড়ায় এসে দেখেন, পায়ের কাছে কি একটা লম্বাটে জিনিস চাঁদের আলোতে চক্চক্ করছে। তুলে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে দেখেন, কুচ্কুচে কালো একটি পালক। তার মাঝখানে একটা চওড়া সাদা ডোরা কাটা, মুখের দিকটা একটু ছুঁচল মতন, একটু ছেঁটে নিলেই খাসা এক খাগের কলম।

"কলমটা হাতে নিতেই হাতের আঙুলগুলো কেমন চিড়্বিড়্ করে উঠল। ঠাকুরদা আর থাকতে না পেরে দিদিমার আলতার শিশি আর ধোপার হিসেবের খাতা নিয়ে বসে পড়লেন। আর সেই অদ্ভুত কলমটি, বিশ্বাস করিস আর নাই করিস, অনবরত কি যে সব মাথামুণ্ডু লিখে যেতে লাগল, পড়ে তো ঠাকুরদার নিজেরই চুল দাড়ি খাড়া হয়ে উঠল।"

এই অবধি শুনে আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে বললাম, "কেন? চুল-দাড়ি খাড়া হবে কেন?"

"আরে, সে যে দাঁড়াল গিয়ে একটা ভূতের গল্প, যা পড়লে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। আমার ঠাকুরদা নিজের লেখা নিজে পড়ে প্রথমটা থ মেরে গেলেন। পরে বুঝলেন ধর্না দেওয়ার ফল ধরেছে। সারাদিন ঘরে বসে গল্পটা মুখস্থ করে ফেললেন, তার পর সন্ধ্যা লাগতে সেজেগুজে রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন।

এক হাঁড়ি শুঁটকিমাছ নিবেদন করে ঠাকুরদা ধর্না দিয়ে পড়ে রইলেন।

"দেখেন গিয়ে, সেই ব্যাটা হাত-পা নেড়ে দাঁত বার করে গান ধরেছে, আর লোকগুলো সব হাঁ করে তাই শুনছে আর বাহবা দিচ্ছে।

"ঠাকুরদা সভায় ঢুকতেই সঙ্গে-সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া এসে ঝাড়লণ্ঠনটার অনেকগুলো আলো নিবিয়ে দিল। গানও তক্ষুনি থেমে গেল, সভাও থম্‌থমে চুপচাপ হয়ে গেল। আর ঠাকুরদা রাজার সামনে এসে সিংহাসনের সিঁড়ির ধাপে বসে নিচু গলায় ভূতের গল্প শুরু করলেন। দেখতে-দেখতে সভাসদরা যে-যার আসন ছেড়ে ঠাকুরদাকে ঘিরে বসল। কবি ছোকরা তো পাঁচজনকে সরিয়ে দিয়ে সব চেয়ে কাছে এসে ঘেঁষে বসল। ঠাকুরদা অর্ধেকটা বলে থেমে গেলেন। কবি ব্যাকুল হয়ে বলল, 'তার পর?' রাজা বললেন, 'তার পর?' সভাসুদ্ধু সকলে বলল, 'তার পর?'

"গল্প শেষ করে ঠাকুরদা হাত জোড় করে বললেন, "মহারাজ, এবার আমায় বিদায় দিন। এখানে খেতে পাই নে, ভিনগাঁয়ে দেখি গিয়ে চেষ্টা করে।' রাজা কিছু বলবার আগেই কবি বললে, 'না, না, সেকি! তা হলে আমাদের ভূতের গল্প কে বলবে? এই নাও আমার মনিব্যাগটা নাও।' দেখতে-দেখতে সভার লোকরা ভিড় করে যে-যা পারে ঠাকুরদার হাতে গুঁজে দিতে লাগল। ঠাকুরদা সে-সব চাদরে বেঁধে বাড়ি গিয়ে সকালবেলায় সব ধার-টার শোধ করে দিলেন।

"তার পর আবার যেই খাগের কলমে হাত দিয়েছেন কি, আবার আঙুল চিড়্‌বিড়্‌ করে আবার সেইরকম লেখা বেরুতে লাগল। এমনি করে ঠাকুরদা এক বছর ধরে তিনশো পঁয়ষট্টিটা ভূতের গল্প লিখে ফেলেছিলেন। আর ঘরের মধ্যে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছিলেন। তাই দিয়েই তো বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, গোরু-বাছুর, ক্ষেত-খামার সব হয়েছিল। তাই থেকেই তো তোরা সব দিব্যি মজা লুটছিস।"

আমরা বললাম, "তার পর উনি থেমে গেলেন কেন? মরে গেলেন বুঝি?"

ছোট্‌ঠাকুরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, "মোটেই মরেন নি! তোরা বললেই ওঁকে মরে যেতে হবে নাকি? মরেন-টরেন নি। তবে এক বছর বাদে একদিন পুরোনো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখেন এই মোটা একটা কালো পাতিহাঁস চান সেরে পাড়ে উঠে পালক সাফ করছে, আর ঠোঁটের খোঁচা খেয়ে এত বড়-বড় কালো পালক এদিকে-ওদিকে পড়ে

যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটাতে একটা করে চওড়া সাদা দাগ আর মুখটা কেমন ছুঁচল ধরনের, একটু ছেঁটে নিলেই খাসা খাগের কলম।

"তাই দেখে ঠাকুরদা ঘরে গিয়ে সিন্দুক থেকে নিজের খাগের কলমটা নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখলেন হুবহু এক, একেবারে বেমালুম মিলে গেল। এমনি মিলে গেল যে কোনটা নিজের পালক তা একদম আর চেনাই গেল না। এক ফোঁটা লাল আলতাও তাতে লেগে ছিল না। রোজ তাকে এত যত্ন করে পরিষ্কার করা হত।

"ব্যস্ গল্প লেখা বন্ধ হল, ঠাকুরদাও পেনসিল নিলেন। কিন্তু তদ্দিনে তাঁর অবস্থাও ফিরে গেছে, চিন্তাও ঘুচে গেছে। শেষ বয়সটা দিব্যি আরামেই কাটল। ঐ গল্পগুলোর কতক-কতক হারিয়ে গেছে, কিন্তু ধোপার খাতায় লেখা প্রথম পঞ্চাশটি আমার কাছে আছে। আমার কথা মতো চলিস যদি, মাঝে মাঝে এক-আধটা শোনাতে পারি।

"ছোট্ঠাকুরদা মারা যাবার আগে আমার উপর খুশি হয়ে ঐ খাতাটা আমাকে দিয়ে গেছেন। এখন ওটি আমার কাছে আছে। তোমরাও যদি আমার কথা মতো চলো তো মাঝে-মাঝে এক-আধটা শোনাতে পারি।"

পেনেটিতে

পেনেটিতে, একেবারে গঙ্গার ধারে, আমার বড় মামা একটা বাড়ি কিনে বসলেন। শুনলাম বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব তাই কেউ সেখানে থাকতে চায় না। সেইজন্য বড় মামা ওটাকে খুব সস্তাতেই পেয়েছিলেন।

যাই হোক, বিয়ে-টিয়ে করেন নি, আপত্তি করবার লোকও ছিল না। মেজো মাসিমা একবার বলেছিলেন বটে, "নাই-বা কিনলে দাদা, কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে কেউ থাকে না কেন?"

বড় মামা রেগে-মেগে বাড়ির কাগজপত্র সই করবার আগে ওঁদের কুস্তির আড্ডার দুজন ষণ্ডাকে নিয়ে সেখানে দিব্য আরামে দু রাত কাটিয়ে এলেন। ষণ্ডাদের অবিশ্যি সব কথা ভেঙে বলা হয় নি। তারা দুবেলা মুরগি খাবার লোভে মহাখুশি হয়েই থাকতে রাজি হয়েছিল। পরে আড্ডায় ফিরে এসে যখন বড় মামা ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন তখন তারা বেজায় চটে গিয়েছিল। "যদি কিছু হত দাদা? গায়ের জোর দিয়ে তো ওনাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যেত না!"

দুমাস পরে বড় মামা সেখানে রেগুলার বসবাস শুরু করে দিলেন। সঙ্গে গেল বঙ্কু ঠাকুর, তার রান্না যে একবার খেয়েছে সে জীবনে ভোলে নি; আর গেল নটবর বেয়ারা, তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, রোজ সকালে বিকেলে আধ-ঘণ্টা করে দুটো আধমণি মুগুর ভাঁজে। আর ঝগড়ু জমাদার, সে চার-পাঁচ বার জেল খেটে এসেছে গুণ্ডামি-টুণ্ডামির জন্য। এরা কেউ, শুধু ভূত কেন, ভগবানেও বিশ্বাস করে না।

আমরা বরানগরে ছিলাম, আমি ক্লাস নাইনে পড়ছি। এমন সময় বাবা পাটনা বদলি হয়ে গেলেন আর আমার স্কুল নিয়েই হল মুশকিল। বড় মামা তাই শুনে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, এমন কিছু দূরও পড়বে না। ব্যাটা বঙ্কুর রান্না খাবে আর আমিও আমার নতুন কবিতাগুলো শোনাবার লোক পাব, বঙ্কুরা তো আজকাল আর শুনতে চায় না। ভালোই হল।"

শেষপর্যন্ত তাই ঠিক হল। মারা যেদিন সকালে পাটনা চলে গেলেন, আমার জিনিসপত্র বড় মামার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল, আর আমিও সারাদিন স্কুল করে বিকেলে গিয়ে সেখানে হাজির হলাম।

মনটা তেমন ভালো ছিল না, মারাও চলে গেছেন আবার আমাদের ক্লাসের জগু আর ভুটে বলে দুই কাপ্তেন কিছুদিন থেকে এমনি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে স্কুলে টেঁকা দায় হয়ে উঠেছিল। আগে ওরাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, কিন্তু পুজোর ছুটির সময় সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা এমন পয়ে আকার ছোটলোকের মতো ব্যবহার আরম্ভ করেছিল যে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন ওরাই হলেন ফুটবলের ক্যাপ্টেন, ক্লাবের সেক্রেটারি। সেদিনও ওদের সঙ্গে বেশ একটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে ; সে আবার অঙ্ক ক্লাসে। আমার একার দোষ নয়, কিন্তু ধরা পড়ে বকুনি খেলাম আমিই। ওরা দেখলাম খাতার আড়ালে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

বাড়ি এসেও মনটা একটু খারাপই ছিল। একেবারে জলের মধ্যে থেকে ঘাটের সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। বিশাল বিশাল ঘর, ঝগড়ু আর নটবর তক্‌তকে করে রেখেছে। প্রায় সবগুলোই খালি, শুধু নীচের তলায় বসবার ও খাবার ঘরে আর দোতলায় দুটো শোবার ঘরে বড় মামা কয়েকটা দরকারি আসবাব কিনে সাজিয়েছেন।

কেউ কোথাও নেই। বড় মামাও কোথায় বেরিয়ে গেছেন। নীচে থেকে বঙ্কুর রান্না লুচি-আলুরদম খেয়ে উপরে গেলাম। বই রেখে, আমার ঘরের সামনের চওড়া বারান্দা থেকে দেখি বাগানময় ঝোপঝাপ, আমগাছ, কাঁঠালগাছও গোটা কতক আছে। গঙ্গার ধার দিয়ে জবা ফুলের গাছ দিয়ে আড়াল-করা একটা সরু রাস্তা একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে চলে গেছে। সেখানে তিনজন মাঝি গোছের লোক মাছ ধরার ছিপ সারাচ্ছে। একজন বুড়ো আর দুজন আমার চেয়ে একটু বড় হবে। ওখানকারই লোক বোধ হয়। আমাকে দেখতে পেয়ে তারা নিজের থেকেই ডাকল। দেখতে দেখতে বেশ ভাব জমে গেল। ওরা বলল, পিছন দিকের পুকুরে আমাকে মাছ ধরা শেখাবে, শনিবার নদীতে জাল ফেলবে, নিশ্চয় নিশ্চয় যেন আসি। বুড়োর নাম শিবু, ছেলে দুটো ওর ভাইপো, সিজি আর গুজি।

বেশ লোকগুলো। বাড়ির মধ্যে আসত-টাসত না, চাকরবাকরদের

এড়িয়ে চলত, কিন্তু আমার সঙ্গে খুব দহরম-মহরম হয়ে গেল। আমাকে সাপ-কামড়ানোর ওষুধ, বিছুটি লাগার ওষুধ, এই-সব শিখিয়ে দিল। আমাদের বাগানেই পাওয়া যায়।

মামা মাঝে মাঝে খুব রাত করে বাড়ি ফিরত। আর দোতলায় একা একা আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতাম। শিবুদের কাছে সে কথা জানাতেই, যেদিনই মামা বেরোতেন, সেদিনই ওরা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে, বারান্দায় বসে আমার সঙ্গে কত যে গল্প করত তার ঠিক নেই। সব মাঝিদের গল্প, ঝড়ের কথা, নৌকাডুবির কথা, কুমির আসার কথা, হাঙর মারার কথা, সমুদ্রের কথা।

ওদিকে স্কুলের ঝগড়া বাড়তে বাড়তে এমন হল যে ঐ জগু, ভুটে আর নেলো বলে ওদের যে এক সাকরেদ জুটেছে, এই তিনজনকে অন্তত আচ্ছা করে শিক্ষা না দিলে চলে না। শিবু বললে, "বাবু, এইখানে ডেকে এনে সবাই মিলে কষে পিটুনি লাগাই।"

বললাম, "না-রে, শেষটা ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে। তার চেয়ে এখানে এনে এমনি ভূতের ভয় দেখাই যে বাছাধনদের চুলদাড়ি সব খাড়া হয়ে উঠবে।" তাই শুনে ওরা তিনজনেই হেসে লুটোপুটি।

আমি বললাম, "দেখ, তোদের তিনজনকে কিন্তু ভূত সাজতে হবে আর আমি ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনব। তোদের সব সাজিয়ে-গুজিয়ে দেব।"

"অ্যাঁ। সেজিয়ে-গুজিয়ে দেবেন কেন বাবু? রঙ-টঙ মেখিয়ে দেবার দরকার হবে না। তিনটে চাদর দেবেন। আমরা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে, গঙ্গার ধারে ঝোপের মধ্যে এমনি এমনি করে হাত নাড়তে থাকব আর ওঁ ওঁ শব্দ করব, দেখবেন ওদের পিলে চমকে যাবে।" ছেঁড়া চাদর তিনটে দিয়ে দিলাম। সত্যি ওদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। ভালোই হবে, তা হলে আমাকে কেউ সন্দেহও করবে না, বাড়ি-টার একটা অপবাদ তো আছেই।

শুক্রবার ইস্কুলে গিয়ে জগু ভুটেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম। বাবা! ওদের রাগ দেখে কে। "কি রে, হতভাগা, ভারি লাটসাহেব হয়েছিস যে? কথা বলছিস না যে বড়?"

বললাম, "মেয়েদের সঙ্গে আমি বড় একটা কথা বলি না। ব্যাচেলর মামার শিক্ষা।" তারা তো রেগে কাঁই—"মেয়েদের সঙ্গে মানে? মেয়েদের আবার কোথায় দেখলি?"

আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিল—ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি।

বললাম, "যারা ভূতের ভয়ে আমাদের বাড়ি যায় না, তাদের সঙ্গে মেয়েদের আবার কি তফাত ?"

জগু রাগে ফোঁস্-ফোঁস্ করতে করতে বলল—"যা মুখে আসবে, খবরদার বলবি না, গুপে।"

"একশো বার বলব, তোমরা ভীতু, কাপুরুষ, মেয়েমানুষ।" জগু আমাকে মারে আর কি! শুধু অঙ্কের মাস্টারমশাই এসে পড়লেন বলে বেঁচে গেলাম।

স্কুল ছুটির সময় ভুটে পিছন থেকে এসে আমার কানে কানে বললে, "সন্ধেবেলা সাতটার সময় তোমাদের বাড়ির বাগানে আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বেড়াব! দেখি তোমাদের ভূতের দৌড় কতখানি। হুঁ, আমাদের চিনতে এখনো তোমার ঢের বাকি আছে।"

আমি তো তাই চাই; শিবুরা আজকের কথাই বলে রেখেছিল।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরলাম, ওদের দেখতে পেলাম না। একটু একটু নার্ভাস লাগছিল, যদি ভুলে যায়। নদীর ধারে একটা ঝোপের পিছন থেকে গুজি ডেকে বলল—"বাবু, সব ঠিক আছে আমাদের।" প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জগু, ভুটে, নেলো তিন কাপ্তেন এসে হাজির।

বড় মামা বেরোচ্ছিলেন, ওদের দেখে আমাকে বললেন, "বন্ধুদের কেচটনগরের মিষ্টি-টিষ্টি দিস, সব একা একা খেয়ে ফেলিস না যেন।" কথাটা যেন না বললেই হত না। ওরা তো হেসেই গড়াগড়ি, যেন ভারি রসিকতা হল।

বড় মামা গেলে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বাগানে গেলাম। এক্ষুনি বাছারা টের পাবেন! চারি দিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু একটু চাঁদের আলোতে সব যেন কিরকম ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে, আমার গা ছম্‌ছম্ করছে। গল্প করতে করতে ওদের গঙ্গার ধারের সেই সরু রাস্তাটাতে নিয়ে এলাম। বাড়ি থেকে এ জায়গাটা আড়াল করা। পথের বাঁক ঘুরতেই, আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিল—ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি! মাথা মুখ হাত সব ঢাকা, আবার হাত তুলে তুলে যেন ডাকছে আর অদ্ভুত একটা ওঁ ওঁ শব্দ! একটু একটু হাসিও পাচ্ছিল।

জগুরা এক মিনিটের জন্য ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, তার পর

আমার দিকে তাকিয়ে—"তবে রে হতভাগা! চালাকি করবার জায়গা পাস নি!"—বলে ছুটে গিয়ে চাদরসুদ্ধ মূর্তিগুলোকে জাপটে ধরল।

তার পরের কথা আমি নিজের চোখে দেখেও যখন বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমরা আর কি করে করবে? ছোঁবামাত্র মূর্তিগুলো যেন ঝুর্‌ঝুর্‌ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, শুধু চাদর তিনটে মাটিতে পড়ে গেল।

জগু, ভুটে, নেলোও তক্ষুনি মূর্চ্ছা গেল।

আমি পাগলের মতো "ও শিবু, ও সিজি, ও গুজি" করে ছুটে বেড়াতে লাগলাম; গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল আর গোলযোগ শুনে বঙ্কু, নটবর আর ঝগড়ু হল্লা করতে করতে এসে হাজির হল। ওরা জগুদের তুলে, ঘরে নিয়ে গিয়ে, চোখে মুখে জল দিল। আমার গায়ে মাথায়ও মিছিমিছি এক বাল্‌তি জল ঢালল।

মামাকেও পাড়া থেকে ডেকে আনা হল। এসেই আমাকে কি বকুনি!

"বল্‌ লক্ষ্মীছাড়া, চাদর নিয়ে গিয়েছিলি কেন?"

যত বলি শিবু সিজি গুজির কথা, কেউ বিশ্বাস করে না।

"তারা আবার কে? এতদিন আছি, কেউ তাদের কোনোদিনও দেখে নি শোনে নি; এ আবার কি কথা? আন্‌ তা হলে তাদের খুঁজে।" কিন্তু তাদের কি আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়? তারা তো আমার চোখের সামনে ঝুর্‌ঝুর্‌ করে কর্পূরের মতো উবে গেছে।

আহিরিটোলার বাড়ি

আহিরিটোলা কোথায় জানো তো? সেখানে গঙ্গার ধারে আমার পূর্ব-পুরুষদের একটা মস্ত বাড়ি আছে। সেখানে কেউ থাকে না। দরজা-জানলা ঝুলে রয়েছে, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, দেয়ালে সব ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। শুধু ইঁদুর বাদুড়ের বাস, আর সব জায়গায় একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বাড়িটা বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কোম্পানির আমলে তৈরি করেছিলেন, কলকাতা শহরই তখন সবে তৈরি হচ্ছে। দিব্যি

চকমেলান দোমহলা বাড়ি, দেয়ালে সব জং ধরে যাওয়া চিত্র-টিত্র করা, বিরাট পাথরের সিঁড়ি। টাকারও তাঁদের অভাব ছিল না, কি সব চোরাকারবার চলত; তখনকার দিনে অত আইন-আদালতের হাঙ্গামা ছিল না। মোট কথা, বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভয়ংকর ধনী লোক ছিলেন। প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ি ছিল, তাতে চারটে কালো কুচ্‌কুচে ঘোড়া জোড়া হত, বাড়ির পিছন দিকে বিশাল আস্তাবল ছিল। সে-সব কবে বিক্রি হয়ে গেছে, তার জায়গায় তিনতলা সব বাড়ি হয়ে, সেগুলো পর্যন্ত ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সেবার প্রি-টেস্টে অঙ্কে পনেরো পেলাম। তাই নিয়ে বাড়িময় সে যে কিরকম হৈ চৈ লেগে গেল সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বাবা পর্যন্ত এমন কাণ্ড আরম্ভ করলেন যে শেষ অবধি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম। কাউকে কিছু না বলে, সন্ধেবেলায় কয়েকটা কাপড় জামার পুঁটলি কাঁধে নিয়ে, ঘড়ি কিনবার জমানো টাকাগুলো পকেটে পুরে, একেবারে আহিরিটোলার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

সেখানে আলো-টালো নেই, রাস্তার আলো এসে যা একটু ভাঙা দরজা জানলা দিয়ে ঢুকছে, অদ্ভুত সব ছায়া পড়েছে। সামনের দরজায় তালামারা। কিন্তু জানলায় শিক নোনা ধরে ভেঙে গেছে, ঢুকতে কোনো অসুবিধা হল না। একটু যে ভয় করছিল না তাও নয়, আর কতরকম শেডের যে অন্ধকার হয়, তাই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। খিদেও পেয়েছে প্রচুর, আবার রাগও হয়েছে। নীচের তলাটা কেমন যেন ঘুপ্‌সিপানা, পুঁটলি বগলে ধুলোমাখা সিঁড়ি দিয়ে দুম্ দুম্ করে উপর তলায় উঠে যাচ্ছি। এমন সময় সিঁড়ির ঠিক উপর থেকে কে বলল— "আহা। তোদের জ্বালায় কি সন্ধেবেলাতেও হাত মুখ ধুয়ে আল্‌বোলাটা নিয়ে একটু চুপ করে বসা যাবে না? সারাদিন শুধু দাও, দাও, দাও, দাও, এটা নেই, ওটা নেই, এটা চাই, ওটা চাই, এবার একটু ক্ষান্তি দে।" ভুর্‌ভুর্ করে নাকে একটা ধূপধুনোর সঙ্গে গোলাপজল আর ভালো তামাকের গন্ধ এল। চেয়ে দেখি তারার আলোতে সিঁড়ির উপর একজন বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভুক্কো রঙের লম্বা জোব্বা পরনে, পায়ে সাদা নাগরাই জুতো, মাথায় ভুক্কো একটা ছোট্ট সাদা টুপি, আর ডান হাতের বকবার আঙুলে একটা মস্ত সবুজ পাথরের আংটি।

যেমন সিঁড়ির উপরের ধাপে এসে উঠেছি, আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এঁ্যা, তোকে তো আগে দেখি নি। তুই এখানে কেন এসেছিস? কি

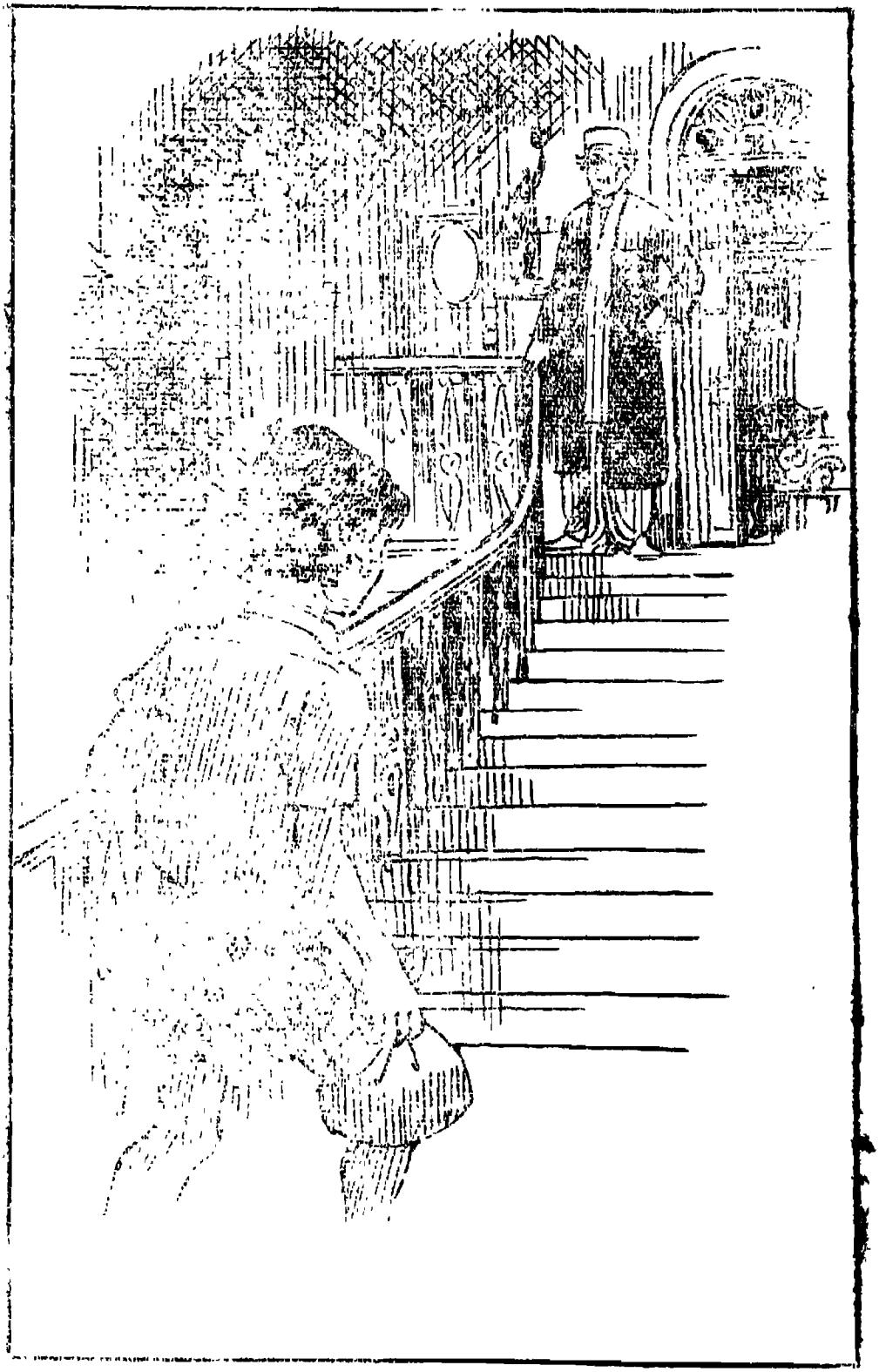

চেয়ে দেখি তারার আলোতে সিঁড়ির উপর একজন
বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন...

চাস তাই বল্ দেখি বাবা?" খিদেয় পেটটা খালি খালি লাগছিল, বললাম, "কেন আসব না, এটা আমার বাবার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার বাড়ি।" ভীষণ চমকিয়ে গিয়ে লোকটি কাছে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাবার নাম কি? তোমার ঠাকুরদাদার নাম কি? নাম শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কোথাও জনমানুষ নেই, চারি দিকে অন্ধকার, রেলিং-এর কাছে গিয়ে বুড়ো হাঁক দিলেন, "পরদেশি! আমিন! বলি, কাজের সময় গেলি কোথায়, আলো দিবি না?" নীচের তলার অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট একটা সাড়া এল, তার পর লম্বা একটা কাচের চাকনি পরানো সেজ হাতে কুচ্‌কুচে কালো, ডিগ্‌ডিগে লম্বা, গোলাপী গেঞ্জি, মিহি ধুতি আর গলায় সোনার মাদুলি পরা একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

"ছিলি কোথায় হতভাগা? বাড়িতে লোক এলে দেখতে পাস না?"

"এজ্ঞে, বারোয়ারিতলায় হাফ-আখড়াইটা একবার দেখে এলাম।"

আমার দিকে ফিরে বলল, "যাবে না, খোকাবাবু, হাফ-আখড়াইতে? কেমন সব সঙ বেনিয়েছে, গান-বাজনা হতেছে।" বুড়ো বললে— "চোপ্ ও-সব ছেলেমানুষের জায়গা নয়। এসো, দাদা তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

সামনের ঘরে গেলাম। মেঝেতে লাল গালচে পাতা, মস্ত নিচু তক্তপোষে হলদে মখমলের চাদর বিছানো। তার কোনায় গোঁফ ঝোলা চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়, কানে মাকড়ি একজন লোক দাঁড়িয়ে। তাকে বললেন—"যাও এখন, বলছি তো দশ টাকা চাঁদা আর পাঁচ ভরি আতর দেব তোমাদের বারোয়ারী পুজোর জন্য, এখন কেটে পড়ো।"

লোকটি চলে গেলে, আমাকে তক্তপোষে বসিয়ে পুঁটলির দিকে চেয়ে বললেন, "ওতে কি? পালিয়ে এসেছ নাকি? কেন?" বলতে হল সব কথা। খানিকটা ভেবে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, "পনেরো পেইছিস? হতভাগা, তোর লজ্জা করে না? আঁক হয় না কেন? শুভঙ্করী পড়িস না? মুখ অমন পাংশুপানা কেন? খেইছিস? এ্যাঁ, খাস নি এখনো? পরদেশি, যা দিকিনি, পচ্চুকে বল গে যা।" পরদেশি চলে গেলে বললেন, "আমার কক্ষনো একটা আঁক কষতে ভুল হত না, আর তুই ব্যাটা একেবারে পনেরো পেলি! জানিস নবাবের কাছ থেকে

সার্টিফিকেট পেইছিলাম, হৌসের সব হিসেবের ভুল শুধরে দিয়েছিলাম বলে। দাঁড়া কুট্টিকে ডেকে পাঠাই, সে তোকে আঁক শিখিয়ে দেবে।"

পরদেশি একটা রুপোর থালায় করে লুচি, সন্দেশ, ছানামাখা, আর এক গেলাস বাদামের সরবত এনে দিল।

তার পর বারান্দার কোণে শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো স্নানের ঘরে আরাম করে হাত-পা ধুয়ে, পাশের ঘরে কারিকুরি করা খাটে সাদা বিছানায় শুয়ে সারারাত ঘুমোলাম।

সকালে পরদেশি এসে ডেকে দিল, "কুট্টিবাবু আঁক শেখাতে এসেছেন।" কুট্টিবাবুও এসে, চিত্র-করা পাটিতে বসে সারাটা সকাল আমাকে অঙ্ক কষালেন। পরদেশি কোনো কথা না বলে দুজনকে দুই গেলাস দুধ দিয়ে গেল। বই নেই, পুঁটলিতে খাতা পেনসিল ছিল, তাই দেখে কুট্টিবাবু মহাখুশি। কি বলব, যে-সব অঙ্ক সারা বছর ধরে বুঝতে পারছিলাম না, সব যেন জলের মতো সোজা হয়ে গেল। কুট্টিবাবুর বই দরকার হয় না, সব মাথার মধ্যে ঠাসা।

উনি চলে গেলে, বারান্দায় বেরিয়ে দিনের আলোতে ভালো করে চেয়ে দেখি এরা সব বাড়িঘর ঝকঝকে পরিষ্কার করে ফেলেছে। উঠোনের ধারে ধারে বড়-বড় টব করে কতরকম পাতাবাহারের গাছ, আর উঠোনে দাঁড়ের উপর লাল নীল হলদে সবুজ মস্ত-মস্ত তোতা পাখি রোদে বসে ছোলা খাচ্ছে।

দেয়াল ঠেস দিয়ে পরদেশি মুচকি মুচকি হাসছে। "কাকে খুঁজছ, খোকাবাবু?" বুড়ো লোকটির খোঁজ করলাম। "কি তার নাম পরদেশি? বড্ড ভালো লোক।" পিছন থেকে তিনি নিজে বললেন, আমার নাম শিবেন্দ্রনারায়ণ, লোকে শিবুবাবু বলে ডাকে। তুমি নাকি ভালো করে অঙ্ক কষেছ, কুট্টি বলছিল। এই নাও তার পুরস্কার। আমার হাতে একটা মস্ত সোনার মোহর গুঁজে দিলেন। "ও কি পরদেশি?" বাইরের দরজায় কারা যেন মহা ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি করছে। "সওরা নয় তো পরদেশি?" পরদেশি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, আমি বললাম, "এই রে, তবে নিশ্চয় বাবা এসেছেন আমাকে খুঁজতে।" ছুটে নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম, মা, বাবা, বড় কাকা আর পিসেমশাই এসেছেন। "ইস্, কি সাংঘাতিক ছেলে বাপু তুমি। এই খালি বাড়িতে অন্ধকারে, কালিঝুলের মধ্যে, খাওয়া নেই দাওয়া নেই দিব্যি রাত কাটিয়ে

দিলে ? বলিহারি তোমাকে।" অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি এক মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার তক্‌তকে উঠোন, তোতা পাখির সারি, শ্বেতাবাহারের গাছ, সব উড়ে গেছে। পাগলের মতো দৌড়ে উপরে উঠলাম, খালি ঘর খাঁ খাঁ করছে, ভাঙা স্নানের ঘরে শ্বেতপাথরের সব টালি খুলে পড়ে আছে। "পরদেশি, ও পরদেশি, শিবুবাবু, কোথায় তোমরা ?"

বাবা আমাকে খপ্ করে ধরে ফেললেন, "জানিস না, শিবুবাবু আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, পরদেশি তাঁর খাস খানসামা।"

আস্তে আস্তে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে মোহরটাকে পকেটে পুরে বললাম, "চলো, টেস্টে আমি অঙ্কে ভালো নম্বর পাব, দেখো।" কাউকে কিছু বলতে পারলাম না।

আমি ঠিক করেছি বড় হয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে আহিরিটোলার বাড়িটা সারিয়ে সুরিয়ে সেখানেই থাকব। গঙ্গাটাও বেশ সামনে আছে

ভুতুড়ে গল্প

বাড়িটাতে পা দিয়েই আমার মেজো পিসেমশাই টের পেলেন কাজটা ভালো করেন নি। বাড়িটার বাইরে থেকেই গা ছম্‌ছম্ করে। কবেকার পুরোনো বাড়ি, দরজা-জানলা ঝুলে পড়েছে, শ্যাওলা জন্মে গেছে, ফোকরে ফাটলে বড়-বড় অশ্বত্থগাছ গজিয়েছে, ফটক থেকে সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা আগাছায় ভর্তি আর তার দু পাশের শিরিষ গাছগুলো ঝোপড়া হয়ে মাথার উপর আকাশটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। সন্ধেও হয়ে এসেছে, চারি দিকে সাড়াশব্দ নেই, কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে।

মেজো পিসেমশাই হাতের লণ্ঠনটা জ্বেলে ফেললেন। বার বার দোতলার ভাঙা জানলার উপর চোখ পড়তে লাগল, বার বার মনে হতে লাগল এক্ষুনি জানলার সামনে থেকে কে বুঝি সরে গেল। মেজো পিসেমশাইয়ের তো অবস্থা কাহিল। অথচ উনি ভূত বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য তাল ঠুকে ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভিতরে।

গঙ্গার উপরে বাড়ি। ঢুকেই একটা বড় খালি হল্‌ঘর, আবছায়াতে হাঁ করে রয়েছে, লণ্ঠনের আলোতে দেয়ালে পিসেমশাইয়ের প্রকাণ্ড ছায়াটা নড়ে বেড়াচ্ছে। পিসেমশাই তাড়াতাড়ি হল্‌ পেরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালেন। প্রকাণ্ড একটা বারান্দা, তার রেলিং ভাঙা, তার পর এক-ফালি সান-বাঁধানো চাতাল, তার চারি দিকে সাদা সাদা সব পাথরের মূর্তি সাজানো। তার পরেই ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি জল অবধি নেমে গেছে, তার অসংখ্য ইঁট জলে ধুয়ে গেছে। সিঁড়ির পাশেই একটা বুড়ো বাতাবিলেবুর গাছ, তার নীচে কবেকার পুরোনো ইঁটের গাদা, রোদে পুড়ে জলে ভিজে কালো হয়ে গেছে। গঙ্গার ওপারে জুট মিলের সাহেবদের বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে পিসেমশাই ফোঁস্‌ করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন।

একতলায় বসে থাকলে চলবে না। উপর যেতে হবে, রাত কাটাতে হবে। নইলে বাজি হেরে যাবেন; ক্লাবে মুখ দেখাতে তো পারবেনই না, উপরন্তু জগুর বাবা সোনালী ছাগলটাকে নিয়ে যাবেন।

হলের দুপাশে সারি সারি ঘর, তাদের দরজাগুলো আধখোলা। দু-একটা বিশাল বিশাল কারিকুরি-করা ভাঙা তক্তপোষ, দু-চারটে প্রকাণ্ড খালি সিন্দুক, এক-আধটা বৃহৎ রঙচটা আয়না ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মেজো পিসেমশাই তাড়াতাড়ি একবার সবটা দেখে নিয়ে এক দৌড়ে উপরে উঠে গেলেন।

দোতলাটাও ঠিক একতলার মতো। সেখানেও মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানি হল্‌। তার মধ্যে আসবাব কিছু নেই, খালি মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বড় ঘোর নীল রঙের গালচে পাতা, তাতে বহুদিনের ধুলো জমে পুরু হয়ে রয়েছে। আর ঘরের কোণে দেয়ালে একটা সেতার ঝুলছে, তাতে তারের কোনো চিহ্ন নেই।

মেজো পিসেমশাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেয়ালের দিকে পিঠ করে, যাতে পিছন দিক থেকে হঠাৎ কিছুতে এসে না পড়ে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না। প্রত্যেকটা ঘরের বর্ণনা দিতে হবে, তাই প্রত্যেকটা ঘর একবার দেখা দরকার। ভয় আবার কিসের? ভূত তো আর হয় না। ঘরগুলি প্রায় সব কটাই দরজা খোলা। একেবারে খালি, ধুলোয় ধূসর। দু-একটাতে ভাঙা ভাঙা আলমারি, প্রকাণ্ড জলচৌকি দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের

দিকে তাকিয়ে দেখেন আলো ঝোলাবার বড়-বড় হুক আছে, তার আশে-পাশের ছাদটাতে ঝুলকালির দাগ রয়েছে। মেজো পিসেমশাই দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তা ছাড়া রাতই যখন কাটাতে হবে একটা বসবার জায়গা তো চাই।

হলের ওপাশে, গঙ্গার উপরে চওড়া বারান্দা। গঙ্গায় একটা স্টীমার যাচ্ছে, তাতে মানুষ আছে, আলো জ্বলছে। ওপারে শত শত আলো জ্বলছে। মেজো পিসেমশাই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়ালেন, ভর দিতে ভয় করে। যদি ভেঙে পড়ে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ঐ তো জাহাজে কত লোক দেখা যাচ্ছে, আঃ।

"এনেছিস? কই দেখি।"

চমকে মেজো পিসেমশাই ফিরে দেখেন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন সাদা জাব্বাজোব্বা-পরা একজন বুড়োমতো লোক। কি ভালো দেখতে, হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙ, দাড়ি নেই, লম্বা গোঁফটা পাকিয়ে পাকিয়ে কানের উপর তুলে রেখেছেন, টানা টানা চোখ। আশ্চর্য ফরসা একখানি হাত বাড়িয়ে বললেন, "দে, দে, দেরি করিস নে। কখন এসে পড়বে।"

মেজো পিসেমশাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন লোকটার গলায় মুক্তোর মালা জড়ানো, কানে মুক্তো পরা, হাতের ভুল আঙুলে হীরের আংটি। এ্যাঁ! এ আবার কে!

লোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই কি বোবা হলি নাকি রে? আজকাল সব যা তা চাকর রাখতে আরম্ভ করেছে দেখছি। আছে, না নেই?"

মেজো পিসেমশাইয়ের গলা-টলা শুকিয়ে একাকার, নীরবে মাথা নাড়লেন।

লোকটি হতাশভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "একটা বসবার জায়গাও কি এগিয়ে দিতে পারিস না? মাইনে খেতে লজ্জা করে না তোর? আমি আর কে, তা বটে তা বটে, আমি এখন আর কে যে আমার কথা শুনবি?"

হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললেন, "অত যে নিলি তখন মনে ছিল না হতভাগা? এর জন্য তোকে কষ্ট পেতে হবে বলে রাখলাম, কি ভীষণ কষ্ট পেতে হবে জানিস না। তিলে তিলে তোকে—

আশ্চর্য ফরসা একখানি হাত বাড়িয়ে বললেন, "দে দে, দেরি করিস নে। কখন এসে পড়বে।"

ঐ রে, এল বুঝি।"

বিদ্যুতের মতো বুড়ো লোকটি হলের পাশের ঘরটাতে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মেজো পিসেমশাইয়েরও যেন কানে এল স্পষ্ট পায়ের শব্দ। দেয়ালের মতো সাদা মুখ করে লণ্ঠনটাকে উঁচু করে ধরে, চারি দিক ভালো করে দেখে নিলেন, কেউ কোথাও নেই। লোকটা নিশ্চয় পাগল-টাগল হবে। অত গয়নাগাটিই-বা পেল কোত্থেকে? কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

লণ্ঠন হাতে বারান্দা থেকে হলে ঢুকলেন। নীচের তলাটা বরং ভালো, একটা তক্তপোষে বসে বসেই রাত কাটানো যাবে। পকেট চাপড়ে দেখলেন 'অশরীরী-খুনে' লোমহর্ষণ ১০নং খানা দিয়ে দিতে জগুর বাবা ভোলেন নি। রাত জেগে ঐটি পড়ে শেষ করে কাল সকালে আগাগোড়া গল্পখানি বলতে হবে। তবে বাজি জেতা।

পা টিপে টিপে হল্ পার হয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সদর দরজার ডান পাশের ঘরখানিতে ঢুকে, ভাঙা সিন্দুকের উপর লণ্ঠন নামিয়ে, তক্তপোষের কোণটা ধুতির খোঁট দিয়ে ঝেড়ে, ধপ্ করে পিসেমশাই বসে পড়লেন। ময়লা খোঁটটা দিয়েই গলার, কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। আঃ, বাঁচা গেল। ভাগ্যিস ভূতে বিশ্বাস করেন না। নইলে তো আজ ভয়েই আধমরা হয়ে যেতে হত।

সামনের রঙচটা আয়নাতে একখানি সাদা ছায়া পড়ল: বুড়ো লোকটি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে, অনুনয়ের স্বরে বললেন, "দিয়েই দে না বাবা। তোর আর কি কাজে লাগবে বল? যারা দেয় তারা প্রাণ হাতে করে এনে দেয়। না পেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। কেন দিচ্ছিস না, বাপ? একে একে সবই তো প্রায় নিয়েছিস, আরো চাস বুঝি? তোর প্রাণে কি মায়া-দয়াও নেই? প্রথম যখন এলি, কি ভালো মানুষটিই ছিলি! আমি উপরের ঐ নীল গালচেটাতে বসে সেতার বাজাতাম, আর তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুনতিস। তোকে কত-না ভালো বাসতাম, এটা-ওটা রোজই দিতাম, কত-না ভালোমানুষ সেজে থাকতিস। ভেতরে ভেতরে তুই যে এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতক কেউটে সাপ তা কি আর জানি।"

মেজো পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে—এক হাত সরে দাঁড়ালেন। বুড়ো

লোকটিও খানিকটা এগিয়ে এলেন, রাগে তার দু চোখ লাল হয়ে গেল, ফরসা দুটো মুঠো পাকিয়ে মেজো পিসেমশাইয়ের নাকের কাছে ঘুষি তুলে বললেন, "একদিন এই ঘুষিকে দেশসুদ্ধ লোকে ভয় করত, কোম্পানির সাহেবরা এসে এর ভয়ে পা চাটত। এখন বুড়ো হয়ে গেছি, দুর্বল হয়ে গেছি, তাই আমার বাড়িতে আমার মাইনে-খাওয়া চাকর হয়ে তোর এত বড় আস্পর্ধা। তবে এখনো মরি নি, এখনো তোকে এক মুঠো ভস্ম—না রে না, কি বাজে কথা বলছি। দিয়ে দে বাবা, দেখ তোকে তার বদলে কি দেব।"

এই বলে বুড়ো লোকটি আঙুল থেকে হীরের আংটিখানি খুলে মেজো পিসেমশাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মরিয়া হয়ে পিসেমশাই ইদিক-উদিক তাকালেন। কি যে দেবেন ভেবে না পেয়ে, পকেটে হাত দিতেই গোলাপী বিড়ির প্যাকেট দুটোর উপরে হাত পড়ল। তাই বের করে বুড়োর হাতে দিয়ে দিলেন।

"সত্যি দিলি? আঃ, বাঁচালি বাবা। এই নে, আমি আশীর্বাদ করছি তোর একশো বছর পরমায়ু হবে।"

এই বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে, মেজো পিসেমশাইয়ের বুকপকেটে আংটি ফেলে দিয়ে হলের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ির দিকে দে ছুট। পিসেমশাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। সিঁড়ির প্রথম ধাপটা অবধি তাকে লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে দেখতে পেলেন, তার পর সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর পিসেমশাইও তক্ষুনি "আরে বাপ" বলে মূর্চ্ছা গেলেন।

পরদিন সকালে জগুর বাবা, পটলের মামা, আমার দাদা, আরো পাঁচ-সাতজনা মিলে ঠ্যাং ধরে টেনে পিসেমশাইয়ের ঘুম ভাঙালেন। উঠে দেখেন ঘরদোর লোকে ভরে গেছে। তাঁরা বললেন, "উপরে গেছিলি? তবে দে, উপরের বর্ণনা দে।"

ঠিক বলছেন কি না পরখ করবার জন্য সবাই মিলে উপরে গেলেন। পিসেমশাইও গেলেন। সব ঘরদোর শূন্য হাঁ হাঁ করছে। জগুর বাবা তো রেগে টং। ইস্, অত ভালো ছাগলছানা হাতছাড়া হয়ে গেল। ইস্, ক্লাবের রাক্ষসগুলোকে তার উপরে বাজির খাওয়া খাওয়াতে হবে।

মাটিতে 'অশরীরী-খুনে' পড়ে ছিল।

"এ্যাঁ। ঠিক হয়েছে। বড় যে ঘুমুচ্ছিলে, বইটা পড়েছিলি? বল্

তবে, আগাগোড়া গল্পটা বল।" মেজোপিসেমশাই-এর মুখে আর কথাটি নেই। মনে মনে দেখতে পেলেন জগুর বাবা সোনালী ছাগলটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সারারাত ঘুম লাগিয়েছেন, স্বপ্ন দেখেছেন, তার উপযুক্ত সাজা তো হবেই।

লজ্জায়, দুঃখে, মাথা নিচু করতেই চোখ পড়ল বুক পকেটের ভিতর হীরের আংটি জ্বলজ্বল্ করছে। মেজো পিসেমশাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বললেন, "নিয়ে যা তোর ছাগল। ইস্ ভারি তো ছাগল।" যজ্ঞে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা বাড়িমুখো রওনা দিলেন।

সত্যি নয়

—দলের মধ্যে মেলা লোক ছিল—মেজো মামা, ভজাদা, জগদীশবাবু, গুপীর সেজদা, গুপী আর শিকারীরা দুজন। সারাদিন বনে জঙ্গলে পাখি-টাখি আর মেলা খরগোশ তাড়িয়ে বেড়িয়ে সন্ধের আগে সকলে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জমিদারবাবুর ঘোড়ার গাড়ি এসে বাজ-পড়া বটগাছের তলায় অপেক্ষা করতে থাকবে, ওঁরা জন্তুজানোয়ার মেরে ক্লান্ত হয়ে গাড়ি চেপে জমিদার-বাড়ি যাবেন। সেখানে স্নান-টান করে রাতে খুব ভোজ হবে। কিন্তু কি মুশকিল, আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও যখন গাড়ি এল না, শিকারীরা দুজন খোঁজ করবার জন্য এগিয়ে গেল। এরা সব গাছতলায় পা মেলে যে যার পড়ে রইল।

আরো মিনিট কুড়ি গেল, দিব্যি চার দিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, তখন জগদীশবাবু লাফিয়ে উঠে পড়লেন।—"ওঠ্ তোরা, এ জঙ্গলে নিশ্চয়ই বাঘ আছে।" খিদেয় সকলের পেট জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর দারুণ পায়ে ব্যথা, কিন্তু ও কথা শুনেই সবাই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। বেশ তারার আলো হয়েছে। তার মধ্যে মনে হল যেন ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে যেন আলো বেশি। সেদিকে খানিকটা যেতেই সবাই অবাক হয়ে দেখল সামনেই বিশাল একটা পোড়ো বাড়ি।

মেজো মামা তো মহা খুশি। বাঃ, খাসা হল, এবার শুকনো

কাঠকুটো জ্বেলে দুপুরের খাবার জন্য যে হাঁড়িটা আনা হয়েছিল তাতে করে খরগোশের মাংস রাঁধা যাবে। নিদেন একটু বিশ্রাম তো করা যাবে। সবাই খুশি হয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

গেটটা কবে থেকে ভেঙে ঝুলে রয়েছে, একটু একটু বাতাস দিচ্ছে, তাতে ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ করছে। বিশ্রী লাগে। পথে সব আগাছা জন্মে গেছে, বাগানটা তো একেবারে সুন্দরবন। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড বারান্দা। বারান্দার উপর উঠে জগদীশবাবু শ্বেতপাথরের মেজের উপর বেশ করে পা ঘষে কাদামাটি পরিষ্কার করে ফেললেন। গুপীর সেজদা একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বলল, "জায়গাটাকে সেরকম ভালো মনে হচ্ছে না।"—"সেজদার যেমন কথা, ঘোর জঙ্গলের পোড়ো বাড়ি আবার এর থেকে কত ভালো হতে পারে।" গুপী আবার বলল, "বাড়িটার বিষয় আমাদের চাকর হরি একটা অদ্ভুত গল্প বলছিল। এদিকে কেউ আসে না।"

একেবারে ভাঙা বাড়ি কিন্তু নয়। দরজাগুলো সব বন্ধ রয়েছে, কেউ বাস করাও একেবারে অসম্ভব নয়। তখন সকলে মিলে মহা হাঁকডাক লাগিয়ে দিলেন। কোনো সাড়া শব্দ নেই। সকলের যে ঠিক ভয় করছিল তা নয়, কিন্তু কিরকম যেন অস্বস্তি লাগছিল, তাই সব এক জায়গায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেজো মামা বললেন— "যা, যা, যে-সব বীরপুরুষ, নে চল্, দরজা ঠেলে খোল্, রাঁধাবাড়ার আয়োজন করা যাক।"

ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল, খালি খালি সব বিশাল বিশাল ঘর, ধুলোতে ঝুলেতে ভরা। সেকালের পুরোনো চক্-মেলানো বাড়ি, মাঝখানে বিরাট এক উঠোন তার মধ্যে আবার একটা লেবুগাছ, একটা পেয়ারাগাছ। সবটাই অবিশ্যি আবছায়া আবছায়া। উঠোনের পাশেই রান্নাঘর, সেখানে উনুন তো পাওয়া গেলই, এক বোঁচকা শুকনো খরখরে কাঠও পাওয়া গেল। মেজো মামা দেখতে দেখতে জায়গাটা খানিকটা ঝাড়পোঁছ করে নিয়ে রাঁধাবাড়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখনো একটু একটু আলো ছিল, কিন্তু ঘরের ভিতর বেশ অন্ধকার। তবে ওঁদের সকলের সঙ্গেই পকেট-লণ্ঠন ছিল। এখন একটু জল চাই।

আর সকলে কেউ-বা উঠোনের ধারে জুতো খুলে পা মেলে দেয়াল ঠেসান দিয়ে বসে পড়েছে, আবার কাউকে যেমন গুপীকে, গুপীর

সেজদাকে খরগোশ কাটবার জন্য লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারাও বলছে জল না হলে পারবে না।

অগত্যা মেজো মামা টিফিন ক্যারিয়ারের বড় ডিবেটা আর একগাছি সরু দড়ি নিয়ে জলের চেষ্টায় গেলেন।

রান্নাঘরের ওপাশে সবজি-বাগান ছিল, তার কোনায় একটা কুয়ো দেখা গেল। মেজোমামা খানিকটা এগিয়ে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়ালেন। আঃ, বাঁচা গেল, এখানে তা হলে লোকজন আছে। যে একটা থম্‌থমে ভাব, আর গুপীটা যা বাজে বকে যে আরেকটু হলে ভয়ই ধরে যেত! এই তো এখানে মানুষ রয়েছে। একটা ছোক্‌রা চাকর ধরনের লোক কুয়োর আশে পাশে কি যেন আঁতি পাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মেজো মামার হাতে আলো দেখে সে ভারি খুশি হয়ে উঠল—"যাক্ আলোটি এনে বড়ই উব্‌গার করলেন বাবু, আমাদের বাবুর মাদুলীটা কোথাও পাচ্ছি না। বাবু আর আমাকে আস্ত রাখবেন না।"

মেজো মামার মনটা খুব ভালো—তিনিও মাদুলী খুঁজতে লেগে গেলেন, "হ্যাঁরে কি রকম মাদুলী রে? এখানে আবার তোর বাবুও বাস করেন নাকি? আমরা তো মনে করেছিলাম বুঝি পোড়ো বাড়ি।" চাকরটা বলল, "আরে ছো, ছো! পয়সার অভাবেই পোড়ো বাড়ি। ঐ মাদুলীটা আমার বাবুকে একজন সন্ন্যাসী দিয়েছিল। ঔষধ হাতে বাঁধা থাকলে যে ঘোড়াতেই বাজি ধরেন সেটাই জিতে যেত। এমনি করে দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠলেন, টাকার গাদার উপরে বসে থাকলেন।—দেখি পাটা সরান এখানটায় একটু খুঁজি। হ্যাঁ তার পর একদিন আমাকে বললেন, বড্ড জং ধরে গেছে রে, এটাকে মেজে আন্। মাজলামও। তার পর যে বিড়ি ধরাবার সময় কোথায় রাখলাম আর খুঁজে পাচ্ছি না। সেই নাগাড়ে খুঁজেই বেড়াচ্ছি, এদিকে বাবুর সর্বনাশ হয়ে গেল। যে ঘোড়াতেই বাজি ধরেন সেটাই হয় মুচ্ছো যায়, নয় বসে পড়ে, নয় খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে। এমনি করে বাড়ি গেছে, বাগান গেছে, টাকা-পয়সা গয়নাগাটি, হাতিঘোড়া সব গেছে। এখন দুজনে দিনরাত সেই মাদুলীই খুঁজে বেড়াই।" উপর থেকে ভাঙা হেঁড়ে গলায় শোনা গেল—"পেলি রে?" "না স্যার।" "বলি খুঁজছিস তো নাকি খালি গল্পই কচ্ছিস?" বলতে বলতে একজন ফরসা মোটা আধবুড়ো লোক দোতালার বারান্দার ধারে এসে দাঁড়ালেন—"দেখ্ দেখ্, ভালো করে দেখ্,

যাবে কোথায় ?" ঠিক সেই সময়ে মেজো মামা একটু ঠেস দিয়ে পাটা আরাম করবার জন্য হাত বাড়িয়ে যেই-না পাশের বারান্দার থামটাকে ধরেছেন অমনি তার ছোট্ট কার্ণিশ থেকে টুপ্ করে পুরোনো লাল সুতোয় বাঁধা একটা মাদুলী মাটিতে পড়ে গেল। সুতোটা আলগা হয়ে গেল, মাদুলীটা গড়িয়ে চাকরটার পায়ের কাছে থামল। চাকরটার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়—"দেন কত্তা দুটো পায়ের ধুলো দেন—বাঁচালেন আমাদের—।" উপর থেকে তার বাবুও দুড়্দাড়্ করে পুরোনো শ্বেতপাথর-বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন।—"পেইছিস! আর আমাদের ঠেকায় কে? বড় উপকার করলেন ব্রাদার, আসুন একটু কোলাকুলি করি—" বলে দুই হাত বাড়িয়ে মেজো মামাকে জড়িয়ে ধরেন আর কি, এমন সময়, "ও মেজো মামা, ও নেপেন-বাবু, কোথায় গেলেন, আর জল দরকার নেই, শিকারীরা ঘোড়াগাড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।" বলে দলে দলে সব এসে উপস্থিত। মেজো মামা চমকে দেখেন চাকরটা, তার বাবু আর মাদুলী কিছুই কোথাও নেই। খালি পায়ের কাছে লাল সুতোটা পড়ে রয়েছে।

আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে বললেন, "চ, খিদেও পেয়েছে ভীষণ!"

পথে যেতে শিকারীরা বললে, "সাহস তো আপনাদের কম নয়, ওটা ভূতের বাড়ি তা জানতেন না? বহুকাল আগে এক জমিদার ছিলেন, রেস খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছিলেন, তাঁর বাড়ি। কেউ ওখানে যায় না।"

যুগান্তর

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের হাফইয়ার্লির ফল বেরুবার ঠিক পরেই। পরীক্ষার আগে দু-তিন দিন ধরে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এত পড়লাম, অথচ ফল বেরুলে দেখলাম ইংরেজিতে ২২, বাঙলায় ২৯, আর অঙ্কের কথা নাই বললাম। তাই দেখে শুধু বাড়ির লোকেদের কেন, আমার নিজের সুদ্ধু চক্ষুস্থির। শেষপর্যন্ত বাড়িতে একরকম টেঁকা দায় হল।

আমার বন্ধু গুপীরও সেই একই অবস্থা। ওর বাবা আরেক কাঠি

বাড়া। ক্লাবের নাম কাটিয়ে-টাটিয়ে, মাউথ-অর্গ্যান কেড়ে নিয়ে একাকার করলেন। সন্ধেবেলায় গুপী এসে বলল, "জানিস, মানোয়ারি জেটি থেকে একটা মালবোঝাই জাহাজ আন্দামান যাচ্ছে আজ!" আমার হাত থেকে পেনসিলটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। বললাম, "কে বলেছে?" গুপী বলল, "মামাদের আপিস থেকে মাল বোঝাই-এর পারমিট করিয়েছে। আজ রাত দুটোয় জোয়ারের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে পড়বে।"

বললাম, "ডায়মণ্ডহারবারের কাছেই ওপার দেখা যায় না। আরেকটু এগুলে না জানি কেমন!" গুপী বলল, "যাবি? না কি জীবনটা রোজ বিকেলে অঙ্ক কষে কাটাবি?" পেনসিলটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম, "পয়সাকড়ি নেই, তারা নেবে কেন?" গুপী বলল, পয়সা কেন দেব? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক সময়ে চড়ে বসে থাকব, মেলা জেলে ডিঙি রয়েছে, তার কোনো অসুবিধা হবে না। তার পর লাইফবোটের ক্যাম্বিশের ঢাকনির তলায় লুকিয়ে থাকতে হয়। তার পর জাহাজ একবার সমুদ্রে গিয়ে পড়লেই হল, ওরও ফেরবার নিয়ম নেই, আমাদেরও নামাবার উপায় থাকবে না। যাবি তো চল্। আজ রাত বারোটায় এসপ্ল্যানেডে তোর জন্য অপেক্ষা করব।"

চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম আন্দামানের ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ টিয়া পাখি উড়ে যাচ্ছে, আর মাথার উপর ঘোর নীল আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে, দূরে সুন্দরী গাছের বন থেকে সারি সারি কালো হাতি বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। বললাম, "বেশ তাই হবে!"

তার পর যে কত বুদ্ধি করে রাত বারোটায় সেখানে গিয়ে গুপীর সঙ্গে জুটলাম সে আর কি বলব। সঙ্গে একটা শার্ট, প্যান্ট, তোয়ালে আর টর্চ ছাড়া আর কিছু নেই। রাতে খাবার সময় ঐ পুরোনো কথা নিয়ে আবার একচোট হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকবার আর আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আর গুপীর কথা তো ছেড়েই দিলাম। সে কোনো দিনই বাড়িতে থাকতে চায় না।

গঙ্গার দিকেই যাচ্ছিলাম। অনেকটা এগিয়েছি, লাটসাহেবের বাড়ির গেটটা পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়েছি, এমন সময় দেখি

গাড়িটা ততক্ষণে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাঁ হাতে ঘুরে এসেম্বলি হাউসের দিকে বেঁকেছে।

ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের পাশে, ইডেন গার্ডেনের সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার গাড়ি আসছে। আমরা তো অবাক। জন্মে কখনো চার ঘোড়ার গাড়ি দেখি নি। কলকাতা শহরে আবার চার ঘোড়ার গাড়ি যে আছে তাই জানতাম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম চারটে কালো কুচ্‌কুচে দৈত্যের মতো বিরাট ঘোড়া। তাদের সাজগুলো তারার আলোয় জ্বল্ জ্বল্ করছে, ঘাড়গুলো ধনুকের মতো বাঁকা, মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, নাক দিয়ে ফড়র্ ফড়র্ আওয়াজ করছে, ঝন্‌ঝন্ করে চেন বকলস্ বেজে উঠছে, অত দূর থেকেও সে আওয়াজ আমার কানে আসছে। ষোলোটা ক্ষুর থেকে মাঝে মাঝে স্পার্ক দিচ্ছে। সে না দেখলে ভাবা যায় না।

গাড়িটা ততক্ষণে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতে ঘুরে এসেম্বলি হাউসের দিকে বেঁকেছে। ঐখানে সারাদিন মিস্ত্রীরা কাজ করেছে, পথে দু-একটা ইঁট-পাটকেল পড়ে থাকবে হয়তো। তাতেই হোঁচোট খেয়ে সামনে দিককার একটা ঘোড়ার পা থেকে নালটা খুলে গিয়ে শাঁই শাঁই করে অন্ধকারের মধ্যে একটা ভাঙা চক্র এঁকে, কতক-গুলি ঝোপ-ঝাপের মধ্যে গিয়ে পড়ল। খানিকটা ক্ষুরের খটাখট্ চেনের ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে, আরো হাত-বারো এগিয়ে এসে, বিশাল গাড়িটা থেমে গেল।

ততক্ষণে আমরা দুজনে একেবারে কাছের গোড়ায় এসে পড়েছি। দেখি গাড়ির পিছন থেকে চারজন সবুজ পোশাক-পরা, কোমরে সোনালী বেল্ট-আঁটা সইস্ নেমে পড়ে, ছুটে গিয়ে চারটে ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে ধরেছে। সামনে দিকের ডান-হাতের ঘোড়াটার চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মাথা তুলে সে একবার ভীষণ জোরে চিঁ-হি-হি-হি করে ডেকে উঠল। সেই শব্দ চার দিকে গম্‌গম্ করতে লাগল। গাড়ির মধ্যে থেকে একজন লম্বাচওড়া লোক নেমে পড়ল।

বোধ হয় ওরা কোনো থিয়েটার পার্টির লোক, কোনো বিদেশী জাহাজে অভিনয় করে ফিরছিল। কারণ লোকটার দেখলাম রাজার মতো পোশাক-পরা, কিংখাবের মখমলের জোব্বা পাজামা, গলায় মুক্তোর মালা, কানে হীরে। আর সে কি ফরসা সুন্দর দেখতে। মাথায় মনে হল সাত ফুট লম্বা। রাজা সাজবারই মতো চেহারা বটে।

ততক্ষণে সবাই মিলে অন্ধকারের মধ্যেই নালটাকে খুঁজছে। আমাদের দিকে কারো লক্ষ্য নেই। আমি টপ্-করে থলি থেকে টর্চটা বের করে টিপতেই দেখি ঐ তো ঝোপের গোড়ায় নালটা পড়ে আছে। রুপোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। গুপী ছুটে গিয়ে সেটি হাতে করে তুলে নিল, তখনো একেবারে গরম হয়ে আছে।

নাল হাতে ওদের কাছে গেলাম। এতক্ষণে আমাদের দিকে ওদের চোখ পড়ল। "কোথায় পেলি বাপ্?" "ঐখানে ঝোপের গোড়ায়" গুপী ঝোপটা দেখিয়ে দিল। "বাঃ, বেড়ে আলোখানি তো বাপ। ওরাই দিয়েছে বোধ হয়। তা হলে আরেকটু দয়া করে, ঐদিকে কোথায় কামারের দোকান আছে বলে দে দিকিনি, ওটি না লাগালে তো আর যাওয়া যাবে না।"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গুপীর দিকে তাকালাম। কামার কোথায় পাব? গুপী বললে, "চলুন, আগে একটা সাইকেল মেরা-মতের দোকান আছে, তাদের আমি চিনি, তারা করে দিতে পারবে মনে হচ্ছে।"

"তা হলে ওঠ্, বাপ্, ওঠ্। আর সময় নেই।"

দুজনে গাড়ির মধ্যে ভদ্রলোকটির পাশে উঠে বসলাম। মখমলের সব গদি। থিয়েটারের লোকেরা আছে বেশ। আর ভুর্‌ভুর্ করছে আতরের তামাকের গন্ধ। ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলা দলিলপত্রও রয়েছে দেখলাম।

গুপী বাৎলিয়ে দিল, বাঁয়ে ঘুরে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে পথ, আস্তে আস্তে চললাম। ঘোড়ার পায়ে ব্যথা লাগে। ছোট্ট গলির মধ্যে দোকান। অত বড় চার ঘোড়ার গাড়ি তার মধ্যে ঢুকবে না। ঢুকলেও আর ঘুরবার উপায় থাকবে না। ভদ্রলোক কেবলই তাড়া দিতে লাগলেন, দেরি করলে নাকি নন্দকুমার নামের একটা মানুষের প্রাণ যাবে। তখন গুপী নাল হাতে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বলল, "এইখানেই দাঁড়ান, আমি গিয়ে যন্ত্রপাতি সুদ্ধু শম্ভুকে ডেকে আনি। তুই আয় আমার সঙ্গে।" অগত্যা দুজনেই নামলাম। শম্ভুকে ঠেঙিয়ে তুলতে একটু দেরি হল। তার পর প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। "চার ঘোড়ার গাড়ি আবার কি? এ তল্লাটে কোথাও চার-ঘোড়ার গাড়ি হয় না। একটা চার-ঠ্যাংওয়ালা ঘোড়াই দেখতে পাওয়া যায়

না। তা আবার চারটে ঘোড়া একগাড়িতে।" শেষটা ঘোড়ার নালটা দেখে একেবারে থ। "এই এত বড় নাল হয় কখনো ঘোড়ার? হাতি নয় তো? হাতির পায়ে আমি নাল লাগাতে পারব না গুপী দাদা, এই বলে দিলাম।"

আমরা বুঝিয়ে বললাম, "চলো না গিয়ে নিজের চোখেই দেখবে। এত প্রকাণ্ড ঘোড়াই দেখলে কোথায় যে এত বড় নাল দেখবে? চলো, তোমার লোহা-টোহা নিয়ে চলো, ওঁদের খুব তাড়াতাড়ি আছে, দেরী করলে কার যেন প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। মেলা কাগজপত্র নিয়ে চলেছেন। চলো। নাও, ধরো, নালটাও তোমার যন্ত্রের বাক্সে রাখ। ভারী আছে।"

শম্ভু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। "বড় ঘোড়া হয় না তা বলছি না। ফতেপুরশিক্রি গিয়ে আকবরের ঘোড়ার যে বিরাট নাল দেখে এসেছি, তার পরে আর কি বলি।"

কথা বলতে-বলতে গলির মুখে এসে পড়েছি। কিন্তু কোথায় চার-ঘোড়ার গাড়ি? চারি দিক চুপচাপ থম্‌থম্ করছে, পথে ভালো আলো নেই, একটা মানুষ নেই, কুকুর নেই, বেড়াল নেই, কিছুই নেই! ডাইনে-বাঁয়ে দু দিকে যত দূর চোখ যায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

রাস্তার আলোর কাছে গিয়ে কি মনে করে শম্ভু যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুলে নালটা বের করতে গিয়ে দেখে বাক্সের মধ্যে নালও নেই। তখন শম্ভু ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে চেয়ে বলল, "ও গাড়ি আরো অনেকে দেখেছে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। ঐ রাজা বাহাদুর মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু সময়কালে পৌঁছতে পারে নি। তোমরা তাই দেখেছ। বলে আমাদের একরকম টানতে টানতে ওর বাড়ি নিয়ে গেল। পরদিন সকালে যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম। গুপী আর জাহাজের কথা তুলল না।

পাশের বাড়ি

ইচ্ছে না হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া অবিশ্বাস করতে পার, স্বচ্ছন্দে বলতে পার আমি একটা মিথ্যাবাদী ঠগ্ জোচ্চোর। তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না, যা যা ঘটেছিল সে আমি একশো বার বলব। আসলে আমি নিজেও ভূতে বিশ্বাস করি না।

বুঝলে, মার মেজো মাসিরা হলেন গিয়ে বড়লোক ; বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি, তার চার দিকে গাছপালা, সবুজ ঘাসের লন, পাতাবাহারের সারি। মস্ত মস্ত শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো ঘর, তার সাজসজ্জা দেখে তাক লেগে যায়। তা ছাড়া মেজো মাসিদের ক্যায়সা চাল, হেঁটে কখনো বাড়ির বার হন না, জলটা গড়িয়ে খান না। কিন্তু কি ভালো সব টেনিস খেলেন, পিয়ানো বাজান। আর কি ভালো খাওয়া-দাওয়া ওঁদের বাড়িতে। আসলে সেই লোভেই আজ গিয়েছিলাম, নইলে ওঁদের বাড়িতে এই খাকি হাফপ্যান্ট পরে আমি! রামঃ!

যাই হোক, ওঁদের পাশের বাড়িটার দারুণ দুর্নাম। কেউ সেখানে পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাস করে নি, বাগান-টাগান আগাছায় ঢাকা, দেয়ালে অশ্বত্থগাছ, আস্তাবলে বাদুড়ের আস্তানা। দিনের বেলাতেই সব ঘুপ্‌সি অন্ধকার, স্যাঁৎসেতে গন্ধ, আর তার উপর সন্ধেবেলায় নাকি দোতলার ভাঙা জানলার ধারে একজন টাকওয়ালা ভীষণ মোটা ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার চেহারা নাকি অবিকল এখনকার মালিকদের ঠাকুরদাদার মতো দেখতে। অথচ সে বুড়ো তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মরে-ঝরে সাবাড়! আর মালিকরা থাকে দিল্লীতে।

নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ভয়ের চোটে কেউ আর ওবাড়ি মুখো হয় না। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। আমি ভূত-টুতে বিশ্বাস করি না। রাতে একা অন্ধকার ছাদে বেড়িয়ে আসি! সত্যি কথা বলতে কি ঐ এক বেড়াল ছাড়া আমি কিছুতে ভয় পাই না। শুধু বেড়াল দেখলেই কিরকম গা-শির্-শির্ করে।

যাই হোক, বিকেলে সবাই মিলে ওঁদের দক্ষিণের বারান্দায় বেতের

চেয়ার-টেবিলে বসে মাংসের সিঙাড়া, মুরগির স্যাণ্ডউইচ্, ক্ষীরের পান্তুয়া, গোলাপি কেক আরো কত কি যে সাঁটলাম তার হিসেব নেই। কিন্তু তার পরই হল মুশকিল। কোথায় এবার গুটি-গুটি বাড়ি যাব, তা নয়! গান, বাজনা, নাচ কবিতা বলা শুরু হল। হাঁপিয়ে উঠি আর কি! শেষটায় কি না আমাকে নিয়ে টানাটানি! আমিও কিছুতেই রাজি হব না! মার মেসোমশাই আবার ঠাট্টা করে বললেন, "ওঃ গান-বাজনা হল গিয়ে মেয়েদের কাজ, আর উনি ভারি লায়েক হয়েছেন। আচ্ছা দেখি তো তুই কেমন পুরুষ বাচ্চা; যা তো দেখি একলা একলা ঐ ভূতের বাড়িতে, তবেই বুঝব কত সাহস!" আর সবাই তাই শুনে হ্যা হ্যা করে হেসেই কুটোপাটি!

শুনলে কথা! রাগে আমার গা জ্বলে গেল, উঠে বললাম, "কি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? ভূত-ফুত আমি বিশ্বাস করি না। এই দেখ গেলাম।" বলেই বাগান পার হয়ে টেনে দৌড় মারলাম। এক মিনিটে পাঁচিল টপ্‌কে ওবাড়ি!

হাঁটু ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই মনে হল ভূত না মানলেও, কাজটা ভালো হয় নি। কিরকম যেন থম্‌থমে চুপচাপ। দুষ্টু লোকদের পক্ষেও ঐখানে লুকিয়ে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।

যাই হোক টিটকিরি আমার কোনো কালেই সহ্য হয় না, কাজেই না এসে উপায়ও ছিল না। গুটি গুটি এগুলাম। তখনো একেবারে অন্ধকার হয় নি, একটু একটু আলো রয়েছে। দেখলাম দরজা জানলা ভেঙে ঝুলে রয়েছে, শ্বেতপাথরের সাদা-কালো মেঝে ফুঁড়ে বটগাছ গজিয়েছে, চার দিকে সাংঘাতিক মাকড়সার জাল। তার উপর আবার কিরকম একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, ভাঙা দরজা জানলা খট্‌খট্ করছে, মাকড়সার জাল দুলছে, দোতলা থেকে কি অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে মানুষ হাঁটার মতো, বাক্সপ্যাঁটরা টানাটানি করার মতো। অথচ মস্ত কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে নীচে পড়ে আছে, এদিক দিয়ে উপরে উঠবার জো নেই। চাকরদের ঘোরানো সিঁড়িও ভাঙা।

মিথ্যা বলব না, বুকটা একটু টিপ্‌টিপ্ করছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বাইরে এলাম। এমন সময় দেখি চাকরদের সিঁড়িটার পাশেই একটা গাছ-ছাঁটা কাঁচি হাতে একজন উড়ে মালি। উঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তা হলে বাড়িটা একদম খালি নয়, জানলায় হয়তো

ওকেই দেখা যায়, আঁক্‌ড়ে মাক্‌ড়ে হয়তো দোতলায় ওঠে।

মালি কাছে এসে হেসে বলল, "কি খোকাবাবু ভয় পেলে নাকি? আমার নাম অধিকারী, হেথায় কাজ করি।" আমি বললাম, "দূর্‌, ভয় পাব কেন? কিসের ভয় পাব?" সে বলল, "না ভয়ের চোটে কেউ আজকাল এই পাশে আসেই না, তাই বললাম।" আমি হেসে বললাম—"যাঃ, আমি ভূত-টুত বিশ্বাস করি না।" অধিকারী লোকটা ভারি ভালো, আমাকে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। দুঃখ করতে লাগল কর্তারা আসে না, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ঝাড়লণ্ঠনগুলো ভেঙে পড়ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের আসবাবে সব পোকা ধরেছে, রোদে জলে মস্ত-মস্ত ছবিগুলোর রঙ চটে যাচ্ছে। বাস্তবিক কিছুই আর বাকি নেই দেখলাম। একা একজন মালি আর কত করতে পারে।

বাগানেও সব হিমালয় থেকে আনা ধুতরো ফুলগুলোতে আর ফুল হয় না, কুচিগাছ মরে গেছে, আমগাছে, ঘুণ ধরেছে, বলতে বলতে অধিকারী কেঁদে ফেলে আর কি—"কেউ দেখতেও আসে না।"

শেষে উঠোনের কোণে ওর নিজের ঘরে নিয়ে গেল। পরিষ্কার তক্‌তকে দাওয়ায় বসিয়ে ডাব খাওয়াল, ভাবছিলাম লোকেরা যে কি ভীতুই হয়। কি দেখে যে ভূত দ্যাখে ভেবে হাসিও পাচ্ছিল। তারার আলোয় চার দিক ফুট্‌ফুট্‌ করছিল। আমার পাশে বসে অধিকারী বলল, "কেউ এ বাড়ি আসে না কেন বল দিকিনি? সেকালে কত জাঁকজমক ছিল। গাড়িতে গাড়িতে ভিড় হয়ে থাকত, গাড়োয়ানরা, সহিস্‌রা এখানে বসে ডাব খেত, তামাক খেত, চার দিক গম্‌গম্‌ করত।" আমি তাকে বললাম, "ওরা বলে কিনা এ বাড়িতে ভূত বেরোয় তাই ভয়ের চোটে আসে না।" শুনে অধিকারী বেজায় চটে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ভূত? এবাড়িতে আবার ভূত কোথায়? নিজের বাড়ির জানলায় বড়কর্তা নিজে দাঁড়ালেও লোকে ভূতের ভয় পাবে? বললেই হল ভূত! আমি তোমাকে বলছি খোকাবাবু, একশো বছর ধরে এবাড়ির কাজ করছি, একদিনের জন্যও দেশে যাই নি, কিন্তু কই একবারও তো চোখে ভূত দেখলাম না?" বলে একবার চার দিকে চেয়ে বলল, "যাই, আমার আবার চাঁদ উঠবার পর আর থাকবার জো নেই।" বলেই, সে তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, লোকটা আমার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। দেশলাই কাঠিতে ফুঁ দিলে আগুনটা

যেমন মিলিয়ে যায়, ঠিক সেইরকম করে। চার দিকে বাতাস বইতে লাগল, দরজা-জানলা দুলতে লাগল, পুব দিকে চাঁদ উঠতে লাগল, আর আমি উর্ধ্বশ্বাসে ভাঙা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই দেখ এখনো হাঁপাচ্ছি।

দামুকাকার বিপত্তি

অনেক দিন আগেকার কথা; আমাদের গাঁয়ের দামুকাকা সন্ধে করে হাট থেকে বাড়ি ফিরছে। সেদিন বিক্রি ভালোই হয়েছে, দড়ির ঝোলাটা চাঁচাপোঁছা, ট্যাঁকটিও দিব্যি ভারী। কিন্তু তাই বলে যে দামু-কাকার মুখে হাসি ফুটেছিল সে কথা যেন কেউ মনে না করে। ওর মতো খিটখিটে রুক্ষ বদ্‌মেজাজি লোক সারা গাঁটা খুঁজে উজাড় করে ফেললেও আরেকটা পাওয়া যেত না। দুনিয়া-সুদ্ধ সকলের খুঁত ধরে বেড়ানোর ফলে এখন এমনি দাঁড়িয়েছিল যে এক-আধটা বন্ধুবান্ধব থাকা দূরের কথা, বাড়ির লোকদের মধ্যেও বেশির ভাগের সঙ্গেই কথা বন্ধ, এমন-কি, ও ঘরে ঢুকলে ওদের বিরাটাকার ছাই রঙের হুলো বিড়ালটা পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ উঠে ঘর থেকে চলে যেত। দামুকাকা সবই দেখতে পেত কিন্তু বেড়ালটাকে মুখে কিছু বলত না। অন্যদের শুধু এইটুকু বলত, "তোদের ভালোর জন্যই তোদের বলি, তা তোদের যদি এতই মন্দ লাগে, যা খুশি কর গে যা, পরে যখন কষ্ট পাবি তখন আমাকে কিছু বলিস না।"

যাই হোক সূর্য অনেকক্ষণ হল ডুবে গেছে, চারি দিক থেকে দিব্যি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, আকাশে চাঁদ নেই, শুধু তারার আলোতে সব ঝাপসা-ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। দামুকাকা হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে, এক ক্রোশ পথ, যত শিগ্‌গির পার হয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। ভূত-প্রেতে দামুকাকার বিশ্বাস নেই, কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে লোকগুলো দিন দিন এমনি পাজি বদমায়েস হয়ে উঠেছে যে পয়সাকড়ি নিয়ে পথে বেরুনোই দায়। বরং বড় কুমড়োটাকে বিক্রি করবার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা না করলেই ছিল ভালো।

প্রায় অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে, মাথাটা কিরকম যেন একটু ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, আসবার আগে হাট থেকে একটা পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তাতেই কাঁচা সুপুরি ছিল হয়তো। তবে বুদ্ধিশুদ্ধি যে সবই দিব্যি চাঙ্গা ছিল, এ কথা দামুকাকা বার বার বলত।

পথের পাশেই বিরাট বাঁশঝাড়, তারার আলোয় পথের উপর তার ছায়া পড়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘোর অন্ধকার করে রয়েছে। ঐখানটার কাছাকাছি আসতেই দামকাকার কেমন গা শির্‌শির্‌ করে উঠল। তবুও হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটি বাগিয়ে ধরে সে বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল।

ঠিক বাঁশঝাড়ের সামনা-সামনি আসতেই মনে হল সুড়ুৎ করে কালো একটা কি যেন পথের এধার থেকে ওধারে গিয়ে বাশঝাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দামুকাকার কানে এল একটা খ্যাঁস্‌ খ্যাঁস্‌ ফ্যাঁস্‌ ফ্যাঁস্‌ শব্দ, তা সে বাদুড়ের না বেড়ালের না আর কিছুর আওয়াজ ঠিক বোঝা গেল না।

ততক্ষণে দামুকাকার বেশ বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ শুরু হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের সকলের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করে সঙ্গী-সাথী নিয়ে দল বেঁধে পথ চলাই যেন ভালো বলে মনে হচ্ছিল।

বাঁশঝাড়ের অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে এমন সময় বাঁশঝাড়ের মধ্যে থেকে কে যেন একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে লাঠিগাছটি হাত থেকে কেড়ে নিল। দামুকাকা দারুণ চম্‌কে উঠে ফিরে দাঁড়াতেই তিন চারটে কালো কালো ডিগ্‌ডিগে রোগা লোক ওকে ঘিরে ফেলে, কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দামুকাকা যে-সে ছেলে নয়। ওর বাবা ছিল সেকালের নামকরা হাজারি পালোয়ান, লাঠিখেলায় সে হাজার শত্রুকে ঘায়েল করেছিল। মেরে ফেলে নি অবিশ্যি, কারণ দামুকাকারা ছিল দারুণ বৈষ্ণব, কিন্তু এইসা ঠেঙিয়েছিল যে তারা পালাবার পথ পায় নি। তাদের মধ্যে যে কটা পেছিয়ে পড়েছিল লম্বা-লম্বা করে একটার পর একটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তবে ছেড়েছিল। কাজেই দামুকাকাও নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়। নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে সে এমনি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগল যে বাঁশগাছগুলো মড়্‌-মড়্‌ করে, ঠিক ভেঙে না পড়লেও, তাদের গা থেকে গোছা-গোছা পাতা খসে পড়তে লাগল, ফালা ফালা ছাল ছাড়িয়ে

আসতে লাগল।

অগত্যা লোকগুলোর মধ্যে একজন একটা কালো গিরগিরে হাত দিয়ে দামুকাকার মুখ চেপে ধরল। মুখ চেপে ধরতেই দামুকাকার নাকে এল কেমন একটা অনেকদিন বন্ধ ঘরের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গন্ধ। ও তক্ষুনি হাত-পা এলিয়ে, দুচোখ কপালে তুলে মুচ্ছো যাবার জোগাড়।

কিন্তু তারা মুচ্ছো যেতে দিলে তো! অমনি খন্‌খনে গলায় পাঁচ-সাত জন মিলে কানের কাছে "ওঁ মোঁড়োলের পোঁ, এঁখন ভিঁমি গেঁলে চঁলবে নাঁ। আমাদের সভায় অঁাগে বিঁচার কঁরে দাও, তাঁর পরে যাঁ ইঁচ্ছে কঁর গে যাঁও। নঁইলে এঁয়ারা যেঁ খ্যাঁচাখেঁচি কঁরে প্রাঁণ অঁতিষ্ঠ কঁরে তুঁললেন।"

তাই শুনে দামুকাকা মুচ্ছো ছেড়ে, উঠে বসে চারি দিকে তাকিয়ে একেবারে থ! বাঁশঝাড়ের মাঝখানটা একদম ফাঁকা, সেখানে একটা ধুনি জ্বলছে, আর তারই চার ধারে একদল কুচ্‌কুচে কালো মেয়ে আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করছে, আর তাদের ঘিরে কাতারে কাতারে কালো কালো ছেলে ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করছে আর খুব কানমলা আর চিমটি খাচ্ছে। এক বেচারা মাথায় একটা হাঁসের পালক গুঁজে একটা ঢিপির উপর বসে ছিল। দামুকাকাকে টেনে সে পাশে বসাল। দামুকাকার ততক্ষণে অনেকখানি সাহস ফিরে এসেছে, জিজ্ঞাসা করল, "তা মশাই, তা হলে আমায় কি করতে হবে?"

"কিঁছু না, শুঁধু এঁই মেঁয়েগুঁলোর মঁধ্যে কেঁ যেঁ কাঁর চেঁয়ে ভাঁলো দেঁখতে সেঁটুকু বঁলে দিন, আঁমরা তো হিঁমশিম খেঁয়ে গেঁলাম। সঁব চেয়ে ভাঁলোর গঁলায় এঁই সোঁনার মাঁলা পঁরিয়ে দিন, আঁর কিছু কঁরতে হবে না।"

দুনিয়ার কোনো মেয়েকে দামুকাকা ভয় পায় না। সামনে এসে হাঁক দিয়ে বলল, "এই সুন্দরীরা, তোরা এখন চ্যাঁচাচেঁচি রাখ দিকিনি। এইখানে লাইন বেঁধে দাঁড়া, আমি ভালো করে দেখি কে সব চেয়ে ভালো দেখতে।

অমনি মেয়েগুলো ঝগড়াঝাঁটি ভুলে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়ে যে যার চুল ঠিক করতে লেগে গেল, হাত-পা সোজা করতে লাগল।

তাদের রূপ দেখে দামুকাকার তো চক্ষু চড়কগাছ! প্রত্যেকটা

সবাই হাসি-হাসি মুখ করে দামুকাকার দিকে চেয়ে আছে।

সমান হতকুচ্ছিত, কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, গোল-গোল চোখ, আর গিরগিরে রোগা। সবাই হাসি-হাসি মুখ করে দামুকাকার দিকে চেয়ে আছে। দামুকাকা একবার তাদের ধারালো দাঁত আর লম্বা-লম্বা নখের দিকে তাকিয়ে দেখল। আর অমনি সব ছেলেগুলো করল কি, গতিক বুঝে তফাতে সরে দাঁড়াল, ভাবখানা, একজনকে মালা দিলেই তো হয়েছে!

কিন্তু দামুকাকা যে-সে ছেলেই নয় সে তো বলেছি, এগিয়ে এসে মেয়েগুলোর দিকে ভালো করে নজর করে আরেকবার দেখে নিয়ে বলল—

"সমবেত ভদ্রমহোদয়াগণ, আমি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করছি যে আপনারা সকলেই সব চেয়ে সুন্দরী, একজনও অন্যদের চেয়ে একটুও কম সুন্দরী নন; অতএব সকলেই এই সোনার মালা পাবার যোগ্যা!" বলেই পট্ করে মালার সুতো ছিঁড়ে ফেলে, প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা করে সোনার পুঁতি দিয়ে, বাকিগুলো নিজের ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে ফেলল। মেয়েরা সবাই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে, আর ছেলেরা সমস্ত গোলমাল এমন নির্বিঘ্নে কেটে যাওয়াতে এমনি খুশি হল যে কেউ আর কিছু লক্ষ্যই করল না।

তখন দামুকাকাও গুটি গুটি বাশঝাড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে সদর রাস্তা ধরে "রাম! রাম!" বলতে বলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাঁয়ের দিকে ছুটল।

বাড়িতে ততক্ষণে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, তার মধ্যে দামুকাকা এসে হাজির হওয়াতে সবাই মহা খুশি। গাঁয়ের লোকও মেলা এসে জড় হয়েছিল; দামুকাকা তাদের হাত ধরে বসিয়ে, মুদির কাছ থেকে চিঁড়ে বাতাসা নিয়ে এসে পেট ভরে খাইয়ে দিল। সবাই অবাকও হল যেরকম, খুশিও হল তেমনি।

এর পরে আর দামুকাকা কখনোও রাগ-মাগ করত না। হাট থেকে সবাই দল বেঁধে ফিরত।

এই গল্প শেষ করে দামুকাকা বলল, "ঐ কালো লোকগুলোর কথা আর কাউকে বলি নি বুঝলি। কি জানি গাঁয়ের লোকেরা যা ভীতু, হয়তো ভূত মনে করে ভয়-টয় পাবে, ও-পথে আর যাওয়া আসাই করবে না, তা হলে আবার হাট-ফেরত আরো আধ মাইল পথ হাঁটতে

হবে। তা ছাড়া সত্যি তো আর ভূত-ফুত হয় না।"

আমরা বলতাম, "ও দামুকাকা, ওরা ভূত নয় তো কি?" দামু-কাকা বিরক্ত হয়ে বলত, "তা আর আমি কি জানি! তবে তোদের ইস্কুলে ওদের চাইতেও অনেক খারাপ দেখতে মেয়ে পড়ে, এ আমার নিজের চোখে দেখা।"

স্পাই

আপনারা সকলেই যে আমার কথা বিশ্বাস করবেন এতটা আমি আশা করি না। সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভগবানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না, ভূতের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তবে সত্যি কথা কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অপেক্ষায় বসে থাকে না, এই ভরসাতে এই কাহিনী প্রকাশ করলাম।

নানা কারণে নামধাম গোপন করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তাতে মূল কাহিনীর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নি। ব্যাপারটা ঘটেছিল দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের শেষে এবং ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে। সে-সব জায়গা আপনারাও দেখেন নি, আমিও দেখি নি, তবে আমার ছোট মামার মুখে যেমন শুনেছিলাম, সেইরকম বিবৃত করে যাচ্ছি।

ছোট মামা বলেছিলেন—

মিলিটারীতে চাকরি করে-করে যে চুল পাকিয়ে ফেলেছি সে কথা তো তোরা সকলেই জানিস। দুনিয়াতে এমন জায়গাই নেই যেখানে নানারকম সামরিক কাজে কোনো-না-কোনো সময়ে আমি যাই নি। গত মহাযুদ্ধের শেষে যাদের কাজ ছিল ফ্রান্সের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে, যত সব বিশ্বাসঘাতক বকধার্মিকরা দেশপ্রেমিকের ভেক নিয়ে নিশ্চিন্তে গা ঢাকা দিয়ে নিজের দেশের সর্বনাশের মধ্যে থেকে বেশ দু-পয়সা করে খাচ্ছিল, তাদের ধরিয়ে দেওয়া; পাকেচক্রে পড়ে আমিও তাদের দলের সঙ্গে জড়িত ছিলাম।

এই সময়ে যে কতরকম অভাবনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল সে তোরা কল্পনাও করতে পারবি না।

ভয় কাকে বলে জানিস? এমন ভয় যে মুহূর্তের মধ্যে হিমের মতো ঠাণ্ডা ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপে হয়ে যায়? তবে শোন।

একবার একটা ভূতের বাড়ির সন্ধান পেয়ে হেডকোয়ার্টারের ভারি সন্দেহ হল। সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গায়, বহুদিনের পুরোনো কালো পাথরের এক বিরাট বাড়ি। কতকাল যে কেউ ওখানে বাস করে নি তার ঠিক নেই। বড়ই দুর্নাম বাড়িটার। দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ বড় একটা যাতায়াত করে না। জানিসই তো, পৃথিবীর সর্বত্রই পাড়া-গাঁয়ের লোকদের মনে এই ধরনের কুসংস্কার থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু গেঁয়ো গুজবে থেমে গেল না। সামরিক বিভাগের দুজন অফিসার এক জলঝড়ের সন্ধেবেলায় ঐখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাড়িটার সম্বন্ধে কানাঘুষো তারাও শুনেছিলেন এবং আমারই মতো তাঁরাও ঘোর নাস্তিক ও ভূত বা পরলোকে অবিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্য দিনের আলো থাকতে থাকতে গোটা বাড়িটা তাঁরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও দেখেছিলেন। বলা বাহুল্য ধুলোয় ঢাকা ঘরগুলির মধ্যে ঘুরে-ঘুরে কিম্বা বাইরে বালি ও বেঁটে-বেঁটে আগাছায় ভর্তি বাগানের দিকে চেয়ে-চেয়ে কোথাও অস্বাভাবিক কিছু তাঁদের চোখে পড়ল না।

চারিদিক অন্ধকার করে রাত নেমে এল, বাড়িটার হাবভাব কেমন যেন বদলে গেল। ধরা ছোঁয়ার মধ্যে তেমন কিছু নয়। কিন্তু সমুদ্রের ও বাতাসের উদ্দাম গর্জনকে ছাপিয়ে বাড়ির ভিতরকার ছোটোখাটো নানান শব্দ যেন বেশি করে তাঁদের কানে আসতে লাগল।

প্রথমটা তাঁরা অতটা গা করে নি, কিন্তু ক্রমশ তাঁদের অস্বস্তির ভাবটা এমনি বেড়ে গেল যে, একটা শক্তিশালী টর্চের আলোতে গোটা বাড়িটা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখলেন এবং শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন যে বাড়িতে নিশ্চয়ই আর কেউ আছে। হাতে হাতে যে প্রমাণ পেলেন তাও নয়। কিন্তু কিরকম জানিস, এই মনে হল স্নানের ঘরে কলের জল পড়ছে; দোরগোড়ায় পৌঁছলেই কে যেন চট্‌ করে কল বন্ধ করে পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অথচ দরজা ঠেলে বাইরে প্যাসেজে বেরিয়ে দেখা গেল কেউ কোথাও নেই, সব ভোঁ ভাঁ।

আবার শোবার ঘরের মধ্যে স্পষ্ট দেশলাই জ্বালবার খস্‌খস্‌ শব্দ

শুনে হড়্‌মুড়্‌ করে সেখানে ঢুকে পড়ে দেখেন কিচ্ছু নেই, মেঝের উপর দুই ইঞ্চি পুরু হয়ে বহু দিনের জমানো ধুলো পড়ে রয়েছে।

অবশেষে দুই বীরপুরুষ অন্ধকারের মধ্যে জলঝড় মাথায় করে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকালে দিনের আলোতে ব্যাপারটাকে খানিকটা হাস্যকর মনে হলেও ঐরকম পরিস্থিতিতে যখন চারদিকে স্পাই খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে তখন, এ বিষয়ে আরেকটু অনুসন্ধান করাই উচিত বলে সকলের মনে হল।

এই ব্যাপারেই তদন্ত করবার জন্য আমরা জনা পাঁচেক সামরিক বিভাগের ঘুঘু অফিসার, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র, চোর ধরার নানারকম ফাঁদ আর ফাঁসজাল, বড়-বড় টর্চ ও শেড-লাগানো লণ্ঠন আর বলা বাহুল্য ঝুড়ি ভরে আহার্য ও পানীয় নিয়ে, সন্ধ্যা নামবার পর রওয়ানা হলাম।

বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে জিপ গাড়িটা রেখে, পায়ে হেঁটে, নিঃশব্দে ও যথাসম্ভব গোপন ভাবে, ভূতের বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

ভয়-টয় পাবার ছেলেই ছিলাম না আমরা। পৌঁছেই চাকা আলো নিয়ে সারা বাড়িটাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিলাম। তার পর এক-তলায় সিঁড়ির পাশের বড় ঘরটার এক ধারের খানিকটা ধুলো ঝেড়ে নিয়ে, মেঝের উপরেই পা মেলে দিয়ে বসে পড়লাম। বিরাট ঘর, উঁচু ছাদ দেখাই যায় না, কার্নিশে কারিকুরি করা, মস্ত গুহার মতো চিমনি, তাতেও কত কারুকার্য, আর তার মধ্যেই চারটে মানুষ অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। বদমাইসদের আস্তানা গাড়বার এমন উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাওয়া দায়।

পাছে ভয় পেয়ে চোর পালায়, তাই নড়ছি চড়ছি পা টিপে-টিপে; নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে রেখেছি, একটা সিগারেট পর্যন্ত ধরাচ্ছি না, আলোতে বা গন্ধে পাছে জানান দেয়। এমনি ভাবে বসে আছি তো বসেই আছি।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, এমন সময় খট্‌ করে কে যেন দোতলার একটা দরজা খুলল, সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ হাত থেকে দরজা ফস্‌কে গেলে বাতাসে যেমন দড়াম্‌ করে বন্ধ হয় সেইরকম একটা আওয়াজ হল। আমরা সতর্ক হয়ে উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে কে যেন নেমে আসছে। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দরজার আড়ালে

এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপ ক্যাঁচ্ কোঁচ্ করে উঠল, তার পর স্পষ্ট দেশলাই জ্বালবার শব্দ। অন্ধকার ভেদ করে আমাদের পাঁচ জোড়া চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল, আবছায়াতে যেন দেখতে পেলাম সে হাত আড়াল করে চুরুট ধরাচ্ছে। পাঁচজনে হঠাৎ টর্চ জ্বেলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সিঁড়ির গোড়ায় ফ্যাকাশে মুখে গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোক। হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তার পরনে চেক-কাটা ছাই রঙের ঝোলাঝালা একটি ড্রেসিং গাউন। মাথায় একটা কালোমতো তেলচিটে ভেল্‌ভেটের গোল টুপি, পায়ে তালি দেওয়া পুরোনো স্লিপার, মুখে একটা সরু লম্বা জঘন্য ময়লা পাইপ, এক হাতে তামা দিয়ে বাঁধানো একটা দেশলাইয়ের বাক্স, অন্য হাতে কাঠি।

নিরীহ গোবেচারি ভদ্রলোক, হাত দুখানি ভয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপছে, চোখে হঠাৎ অত আলো পড়াতে যেন ধাঁধা লেগে গেছে, সর্বাঙ্গে ভয়ের ছাপ।

আমরা পাঁচজনে কাণ্ড দেখে অট্টহাস্য করে উঠলাম। ঘাড় ধরে তাকে টেনে ঘরের মধ্যে এনে, উজ্জ্বল সব আলো জ্বেলে তাকে প্রশ্ন করতে লেগে গেলাম। এতক্ষণ পর স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

লোকটি কিন্তু বোকা সেজে রইল। আম্‌তা-আম্‌তা করে নাম বললে, ফিলিপ বারো। বার বার বললে, এই বাড়িতেই বাস করে। তার চেয়ে বেশি কিছু বের করা গেল না, কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে, পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে না।

তখন আমরা বুদ্ধি করে খাবারের ঝুড়ি খুললাম। অত খাবার দেখে তার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। যুদ্ধের মধ্যে ও পরে ও-সব দেশের লোকেদের সে যে কি কষ্ট, সে আর তোদের কি বলব। হয়তো দু-তিন বছরের মধ্যে এত খাবার একসঙ্গে দেখেই নি। তার সারা মুখে দারুণ একটা খিদে-খিদে ভাব।

তবুও লোকটা যে একটা স্পাই এ বিষয়ে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এইরকম ভীতু চেহারার মানুষরাই ভালো স্পাইগিরি করতে পারে। তাদের আসা-যাওয়া কারো নজরে পড়ে না, কেউ

তাদের সন্দেহ করে না। কিন্তু এইরকম একটা ক্ষুধার্ত ক্যাংলা স্পাই জন্মে কেউ দেখি নি।

যাক ভূতের বাড়ির রহস্যটা এতক্ষণে খানিকটা খোলসা হল বলে সকলে মহা খুশি হয়ে তাকে পেড়াপীড়ি করে খাওয়াতে লাগলাম। আর সেও অকাতরে থাক-থাক স্যাণ্ডউইচ বিস্কুট আর ফ্লাস্ক থেকে চা গিলতে লাগল। অবিশ্যি আমরা নিজেরাও যে উপোস করে রইলাম তা নয়। বাইরে সমুদ্রের উপর দিয়ে হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, মস্ত-মস্ত ঢেউ এসে পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ছে আর ঘরের ভিতর লণ্ঠনের কোমল আলোতে খাবারদাবার নিয়ে সকলে গোল হয়ে বসে দিব্যি একটা মজলিসি আবহাওয়া গড়ে তুলেছে।

লোকটার কাছ থেকে কিন্তু সত্যিই বিশেষ কিছু খবর পাওয়া গেল না। তার পিছনে কে আছে, কি ধরনের তাদের কাজের পদ্ধতি সে বিষয়ে হ্যাঁ না কিছুই বলে না। শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন লুই বললেন, 'ব্যাটা হয় নিরেট বোকা, নয় দারুণ চালাক। ওকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া ছাড়া তো উপায় দেখছি না।'

আমার নিজের লোকটার উপর কেমন একটা মায়া পড়ে যাচ্ছিল। এরকম একটা অসহায় নিরবলম্ব ভাব কখনো আমার চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বেচারা, ভয়েই আধমরা। যদি সত্যিই স্পাইও হয়, তবুও সে যে নিজের তাগিদে হয় নি, অপর কেউ ভয় দেখিয়ে জোর জবরদস্তি করে দলে বাগিয়ে নিয়েছে, এইরকম আমার মনে হতে লাগল। আর সেইজন্যই ওকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া দরকার, সেটাও বুঝতে পারলাম।

শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন লুই বললেন, 'তুমি তো নিজের কোনো পরিচয় দিতে পারছ না। নাম বলছ অথচ কি করে তোমার দিন চলে বুঝি না; আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় বলতে পারছ না।' লোকটা দুহাতে মুখ ঢেকে বললে, 'নেই, তারা কেউ নেই।' তার সর্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। ক্যাপ্টেন লুই-এর দয়া-মায়া ছিল, তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'তা বললে চলবে না, তুমি যে স্পাই নও তাই-বা কে বলবে?'

সে হঠাৎ মাথা তুলে অনেকখানি স্পষ্ট করে বলল—'স্পাই? কার স্পাই? কে আছে যার জন্য স্পাই হব?'

'আচ্ছা, এখন হেডকোয়ার্টারে চলো তো। যদি স্পাই নাই হও তবে

ক্যাপ্টেন লুইও ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তো ভালোই। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।

কিন্তু সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ অন্ধভাবে সিঁড়ির দিকে দৌড় মারল। ক্যাপ্টেন লুইও সঙ্গে-সঙ্গে 'আরে, ধর, ধর' করে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সে একবার চারিদিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে, 'না, না, না, এটা আমার বাড়ি। এখান থেকে আমি কোথাও যাব না,' এই বলে, কি আর বলব তোদের, সেই আমাদের পাঁচজনের ঔৎসুক্য-ভরা চোখের সামনে, সেই লণ্ঠনগুলির উজ্জ্বল আলোতে, মুহূর্তের মধ্যে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন লুই এর মনে হল বুঝি বাতাসকে আলিঙ্গন করছেন।

বুঝতেই পারছিস আমরা আর এক দণ্ডও অপেক্ষা না করে, জিনিসপত্র সব সেখানে ফেলে রেখে, টলতে-টলতে কোনোরকমে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মিলিটারি ব্যাপার ঐখানে শেষ হয়ে যেতে পারে না। পরদিন লোকজন গিয়ে জিনিসপত্র উদ্ধার করে আনল। বহু অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ও বাড়ি খালি পড়ে আছে। মালিকরা ঐ সময়ে নির্বংশ হয়ে গিয়েছিলেন।

নটরাজ

আমাদের রাঁধবার লোকটির খাসা রান্নার হাত থাকলেও একটা মুশকিল ছিল যে রান্নাঘরে সে কিছুতেই একা থাকবে না। বলুন তো আজকালকার দিনে এ-সব নবাবী করলে কেমন করে চলে? অথচ দিশি রান্নাছাড়াও সে আশ্চর্য সব বিলিতি রান্না জানত; পুদিনা দিয়ে এক-রকম অম্বল করত, বাতাসার সঙ্গে তার কোনো তফাত ছিল না। দুধ দিয়ে আর এক চামচ মাখন দিয়ে এমন চিংড়ি মাছ করত সে না খেলে বিশ্বাস হয় না। বন্ধুবান্ধবরা ওর তারিফও করত যেমন, হিংসাও করত তেমনি। এখন ঐ একটি অসুবিধার জন্য সব না পণ্ড হয়ে যায়।

আমি বললাম "নটরাজ, তা বললে চলবে কেন, আজকাল একটা লোক পুষতেই ট্যাঁক গড়ের মাঠ! তোমার জন্য আবার একটি সঙ্গী এনে

দিতে হবে, এ বাপু তোমার আব্দার। চারটি মনিষ্যির রান্নার জন্য দু-দুটো লোক এ কে কবে শুনেছে?"

নটরাজ মাথা নিচু করে বলল, "ঠিক তা নয়, মা। অন্য লোকটার রান্না না জানলেও চলবে। ঐ সামান্য কাজ, সে আমি একাই করে নিতে পারি। সেজন্য নয়।" অবাক হয়ে বললাম, "তবে?"

নটরাজ মাথা চুলকে বললে, "আসল ব্যাপার কি জানেন মা, রান্নাঘরে একা আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

"তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একা আবার কি? সন্ধেবেলা টিকারামের সেরকম কাজ থাকে না, সে তো স্বচ্ছন্দে ওখানে বসতে পারে। ভূতের ভয় আছে বুঝি? পাড়াগাঁর লোকদের ঐ এক মুশকিল। আসলে যে-সব ভয়ের জিনিস, এই যেমন চোর-ছ্যাঁচড়, তার ভয় নেই, দিব্যি পিছনের দরজা খুলে রেখে বিড়ি কিনতে যাবে, অথচ ভূত আছে কি নেই, তারই ভয়ে আধমরা। এটা কি ঠিক উচিত হল বাছা? গাঁ থেকে চলে এসেছিসও তো বহুদিন। আর দিনের বেলায় ভূতের উপদ্রব কে কবে শুনেছে?"

নটরাজ কখনো মখোমুখি উত্তর দেয় না। নরম গলায় বললে, "গাঁয়ে থাকতে কিছুকেই ভয় করতাম না মা। গাঁ ছেড়ে এসেই তো যত বিপদ।"

আমি চালের বাক্সের উপর বসে পড়ে বললাম, "ব্যাপারটা একটু খোলসা করেই বল না, দেখি কি করতে পারি।"

যেন একটু খুশি হয়ে নটরাজ বললে, "মানুষ সাথী না হলেও চলবে, মা।" শুনে আমি দারুণ চমকে ওঠাতে আরো বলল, "মানে একটা কুকুর হলেও হবে, মা। একটা বড় দেখে কুকুর হলেই সব চেয়ে ভালো হয়।" আমি অবাক হয়ে বসেই রইলাম, নটরাজ বলল, "বুঝলেন মা বাড়ি আমাদের অজয় নদীর ধারে, ইলেম বাজারের পাশে। বোলপুর সিউড়ির বাস ওর ধার ঘেঁষে যায়। আমাদের মা মহাময়ী এমনি জাগ্রত দেবতা, মা, যে গোটা গাঁটাকে বুকে আগলে রেখেছেন, কারো চুলের ডগা ছোঁয় ভূত পিরেতের সাধ্য কি। ভূতের ভয় কোনোদিনই ছিল না।

"কিন্তু বাড়িতে খাওয়া জুটত না তাই নকুড়মামার সঙ্গে কলকাতায় এলাম। ঐ যে মিশিন রো, ঐখানে এক বাঙালী সাহেবের বাড়িতে নকুড়মামা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। শুনতে বেশ ভালোই চাকরি মা।

সাহেবের পরিবার নেই, দিনভর বাইরে বাইরে থাকে, দুপুরে আপিসে খায়, চাপরাশি পাঠিয়ে দেয়, আমি রেঁধে-বেড়ে টিপিনকারিতে গুছিয়ে দিই, সাদা ঝাড়নে পিলেট কাঁটা চামচ বেঁধে দিই ; ওদিকে সৌখীনও ছিল মন্দ না। আর সারাটা দিনমান বাড়ি আগলাই ঝাড়-পোঁচ করি, খাই-দাই। আবার বিকেলে রাতের জন্য রাঁধাবাড়া করি, সাহেবের চানের জল গরম করে রাখি। রাত নটা দশটার সময় সাহেব আসে, প্রায়ই দুটো-একটা বন্ধুবান্ধবও সঙ্গে আনে, তারাও খায়-দায়।

"সারাদিন বেশ যেত মা, ঐ রাতেই যত মুশকিল। সাহেব লোক খুব মন্দ ছিল না, মা, দয়ামায়াও ছিল, আমায় এটা ওটা দিত, দেশের চিঠিপত্তর এল কি না জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু বোধ হয় নেশা-ফেশা করত ওরা সবাই, নিশ্চয় করত, নইলে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব অদ্ভুত ফরমায়েস করত যে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেত।

রাতে কিরকম গুম্ হয়ে থাকত। আমার দিকে চাইত যখন চোখ দুটোকে দেখে মনে হত, যেন ছেলেদের খেলার দুটো গোল গোল মার্বেল। কিরকম একদৃষ্টে চেয়ে থাকত, কথা বলত না, আমার বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে থাকত। ভাবতাম চলে যাই, আবার দেশের বাড়ির অভাব অনটনের কথা মনে করে থেকে যেতাম। অন্য সময় সত্যি লোক ভালোই ছিল। রাতে বদলে যেত।

"আমরা মিশিন রো'র ঐ আদ্যিকালের পুরোনো বাড়িটার তিন তলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। রান্নাঘরের পাশে চাকরদের সিঁড়ি, তারই ওধারে পাশের ফ্লাটের রান্নাঘরের দরজা। তাইতেই আমার সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। ঐখানে এমন ভালো এক মেম থাকত মা, আধ বুড়ি, সবুজ চোখ, লাল চুল, দিব্যি বাংলা বলে, আর মা, দয়ার অবতার।" বলে নটরাজ বোধ হয় তারই উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার করল।

"বিপদে পড়লেই আমাকে বাঁচাত। দোরগড়ায় একবার দাঁড়ালেই হল। কি করে যেন টের পেয়ে যেত, অমনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসত।

" 'আজ আবার কি চায়? সাদা সির্কা? তা অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এই নে।' বলে হয়তো একটা গোটা বোতলই দিল আমার হাতে। কাজ শেষ হলে কিছু বাকি থাকলে ফিরিয়ে দিতাম।

"কিম্বা হয়তো "কি হল আবার? গুলাস্? আয় আমার সঙ্গে।'

ওদের রান্নাঘরটি মা সাক্ষাৎ স্বর্গ! কি ছিল না সেখানে? যা দরকার দেরাজ খুলে, ডুলি খুলে বের করে দিত। সব ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করত। বাসনের পিঠে মুখ দেখা যেত। ঐখানেই মা ওনার কাছেই আমার রান্না শেখা, সকালে কি দিনেরবেলায় কত যত্ন করেই যে শেখাত, মা। নইলে আর পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু ছেলে আমি, এত সব জানব কোত্থেকে!

"তাই বল নটরাজ, আমি বলি এত ট্রেনিং কোথায় পেলি? তাপ্পর, ও চাকরি ছাড়লি কেন?"

"ছেড়েছি, কি আর সাধে, মা। একটি বচ্ছর এক নাগাড়ে কাজ করেছিলাম, একবারও দেশে যাই নি। কলকাতায় ঐ এক নকুড়মামাকে চিনি, তা সেও আমাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে এমনি ডুব মারল যে বচ্ছরান্তে তার আর পাত্তা পেলাম না। কেউ আমার সঙ্গী-সাথী ছিল না, মা। বয়সটাও বেশি ছিল না, এমনি দারুণ মন খারাপ হয়ে যেত, মা, সময়ে সময়ে, যে মাঝে মাঝে দুপুরে হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে কান্নাকাটি করতাম।

"একদিন মেম টের পেয়ে আমাকে একটি সুন্দর ছবির বই দিয়ে গেল বিলেত দেশের কত ছবি। পেরথম পাতায় মেমের নাম ছিল, সে তো আমি পড়তে পারি নে, বলেছিল ওটা কেটে আমার নাম লিখে নিতে। করেছিলামও তাই। কিন্তু ও চাকরি আমার আর বেশিদিন টিকল না।

"একদিন রাত্রে সাহেবকে খাইয়ে-দাইয়ে রান্নাঘরে এসে বইটা ঘাঁটছি, আর থেকে থেকে মেমের দরজার দিকে তাকাচ্ছি, ভোরের চায়ের দুধ ছিঁড়ে গেছে, তাই ও আমায় এক কাপ দেবে বলেছিল। এমনি সময় বোধ হয় আমাকে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে, সাহেব এসে হাজির।

আমার তো হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছেন। রাগে সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, রাতে ঐরকম সামান্য কারণেই রেগে চতুর্ভুজ হয়ে উঠত। কি একটা বলতে যাবে, এমনি সময় বইটার উপর চোখ পড়ল।

"অমনি কি বলব মা, ওর মুখটা দেয়ালের মতো সাদা হয়ে গেল, দেহটা কাঁপতে লাগল। পাগলের মতো ছুটে এসে আমার গলা টিপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল, 'বল হতভাগা, ও বই কোথায় পেলি?' অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বলাতে, কিরকম অদ্ভুত করে হেসে বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি! ওখানে মেম থাকে না আরো কিছু! ওটা আগাগোড়া গুদোমখানা,

মেমটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে, সাহেবের হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে...

আমাদেরই অফিসের গুদোমখানা, কেউ থাকে না। বল্ কে তোকে এ-সব শিখিয়েছে? নইলে মেরেই ফেলব। জানিস দরকার হলে মানুষ মারতেও আমার বাধে না।'

"ভয়ে কেঁদে তার পায়ে পড়ছিলাম, মা। বার বার বলতে লাগলাম ঐ রান্নাঘরে খোঁজ করতে, মেম নিশ্চয় স্বীকার করবে ও বই ও-ই দিয়েছে। তাই শুনে রাগে অন্ধ হয়ে সাহেব ছুটে গিয়ে দরজায় দমাদম্ কীল মারতে লাগল। কীলের চোটে দরজার ভিতরকার ছিটকিনি খসে গেল, দরজা খুলে গেল।

অবাক হয়ে দেখলাম, কোথায় ঝক্‌ঝকে রান্নাঘর! এ ঘরের ছাদ থেকে মেজে অবধি পোকা খাওয়া কাগজপত্রে ঠাসা।

সাহেব আমাকে ঘাড় ধরে এ ঘর থেকে ও ঘর নিয়ে ঘুরিয়ে আনল। কোথাও মানুষের বাসের কোনো চিহ্নই নেই মা, শুধু খাতাপত্র, কাগজের তাড়া।

তার পর আবার ফিরিয়ে এনে, ওদের রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে, আমাকে তেমনি করে ধরে আমাদের রান্নাঘরে এসে ঢুকল। এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। কিন্তু মা, তার ঐ মার্বেল পাথরের মতো চোখের কথা মনে করে এখনো গা শিউরে ওঠে। ঐরকম অদ্ভুত করে আমার দিকে চেয়ে, বইটাকে আমার মুখের কাছে তুলে ধরে, চাপা গলায় বলল, 'শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করছি, কে তোকে আমার পেছনে লাগিয়েছে? এ বই কোথায় পেলি? মেমের কথা কে বলেছে?' সত্যি বলব মা, তখুনি আমি ভয়ের চোটেই মরে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়, ক্যাঁচ্ করে অন্য রান্নাঘরে দরজাটা খুলে গেল; সবুজ চোখ, লাল চুল আধা বয়সী মেমটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে, সাহেবের হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে আস্তে আস্তে আবার ঐ রান্নাঘরে ঢুকে গেল, দরজাটা আবার ক্যাঁচ্ করে বন্ধ হয়ে গেল। আর সাহেবও গোঁ গোঁ শব্দ করে অজ্ঞানই হয়ে পড়ে গেল, না মরেই গেল সে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম না; হুড়্‌মুড়্ করে ঐ পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বিনা টিকিটে একেবারে দেশে চলে গেলাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "তার পর সাহেবের খবর নিলি না?' নটরাজ বললে, "ও বাবা! আমি আর সেখানে যাই! পাঁচ বচ্ছর দেশে বসে রইলাম। রোজই ভয় হত ঐ বুঝি পুলিশ এল সাহেব কি

করে মল্ল জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু সে মরে নি নিশ্চয়।

তার পর দেশে খাওয়া জোটে না মা, তাই আবার এলাম কাজ করতে। এইখানেই মন বসে গেছে মা, যদি একটা বড় দেখে কুকুর রাখেন তো থেকেই যাই।

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কুকুরে কি ওনাদের ঠেকাতে পারে রে।" নটরাজ জিব কেটে বললে, "ছি ছি। ও কথা ভাবলেও পাপ। ওনার জন্য কুকুর নয়, বলি কি সাহেবটা যদি আমার খোঁজ পায় তাই।"

কর্তাদাদার কেরদানি

ছোটবেলা থেকে আমার মেজো কর্তাদাদামশায়ের গুণগান শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। ছুটি-ছাটাতে যখনি ডায়মণ্ডহারবারে বাবাদের বিশাল পৈতৃক বাড়িতে যেতাম বুড়ো-ঠাকুমা, ঠাকুমা আর মা-পিসিমাদের মুখে মেজো কর্তাদাদামশায়ের প্রশংসা আর ধরত না। ঐ অত বড় বাড়ি, বাড়ি ভরতি কালো কালো কাঠের বিশাল বিশাল আসবাব, দেয়াল জোড়া চটা ওঠা গিল্‌টি ফ্রেমের বিরাট আয়না, একশো বিঘে জমি, তার মধ্যে পাঁচটা কালো জলে ভরা প্রকাণ্ড পুকুর, তাতে মাছ কিল্‌বিল্ করত, আম-কাঁঠালের বন, নারকেল বাগান, বাঁশ-বন, সবই ছিল যেন সোনার খনি আর সবই নাকি হয়েছিল ঐ মেজো কর্তাদাদামশায়ের দয়ায়। প্রশংসা করবে না কেন লোকে? ছেলেপুলে ছিল না যে ভাগ বসাবে। বিয়েই করেন নি যে শ্বশুর বাড়ির লোকরা এসে হাঙ্গামা বাধাবে। তিন পুরুষ ধরে সবাই মিলে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে, ছাপর খাটে অষ্টপ্রহর হাত-পা মেলে, কেবল খেয়েছে আর ঘুমিয়েছে আর লোহার সিন্দুক থেকে নগদ টাকা বের করে নিয়ে খরচ করেছে।

অবিশ্যি এক পুরুষ পেরোবার আগেই লোহার সিন্দুকের টাকাকড়ি চাঁচাপোঁছা, তখন আরো লোহার সিন্দুক থেকে গয়নাগাঁটিগুলো বের করে ওয়ারিশদের মধ্যে পঞ্চায়েতের মোড়ল এসে সমান-সমান ভাগ করে দিয়ে গেল। তবু কি আর সবাই খুশি হল। আমাদের বুড়ো-ঠাকুমা বলতেন কিন্তু

ঐ থেকেই কান্তি মোড়লের আত্মার সদ্গতিও হয়েগে ছিল। কারণ ঐ গয়নার ডাঁই দেখে অবধি তার চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছিল। তা ছাড়া কোনো কোনো ছোকরা ওয়ারিশ ভাগাভাগিতে অসন্তুষ্ট হয়ে বাঁশপেটা করে বুড়োকে গাঁ ছাড়া করবে বলেও হয়তো ভয় দেখিয়ে থাকবে। মোট কথা শেষপর্যন্ত সে বিষয়-আশয় ছেলেপুলেদের বুঝিয়ে দিয়ে লোটা-কম্বল ও গিন্নিকে নিয়ে কাশীবাসী হয়েছিল। বলা বাহুল্য সেখানে কিছু পয়সাকড়ি ও গঙ্গাতীরে ছোট একটা বাড়ি আগে থাকতেই মজুত করা ছিল।

সে যাই হোক গে, গয়নাগাঁটিও কারো চিরকাল থাকে না। শেষে এমন দিন এল যখন একটা একটা করে সেগুলো বেচে বেচে, তারও কিছু অবশিষ্ট রইল না। তখন ফলের বাগান, পুকুরের মাছ জমা দেওয়া ছাড়া গতি রইল না। তার পর সেগুলোকেও একে একে বেচে দিতে হল। মোট কথা আমরা যখন ছোটবেলায় ছুটি-ছাটাতে ডায়মণ্ডহারবার যেতাম তখন দেখতাম আমাদের বলতে আছে শুধু বিশাল এক পোড়ো বাড়ি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব কালো হয়ে যাওয়া খাট আলমারি, যা কেউ কিনতে তো রাজি হয়ই না, দিতে চাইলেও নিতে চায় না, কারণ কারো দরজা দিয়ে ও-সব ঢুকবে না।

আর ছিল দেয়াল জোড়া রঙচটা আয়না, যাতে মুখ দেখে করে সাধ্যি, আর একটা পুকুর, তাও শ্যাওলাতে ঢাকা, কিন্তু নাকি হাঙরের মতো বড়-বড় মাছে ভরা। আর ছিল বিশাল পোড়ো বাড়িটাকে ঘিরে শতখানেক আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাতাবিলেবু, তেঁতুল, নারকেল, জামরুলের গাছ আর আগাছায় ভরা বিঘে পাঁচেক জমি। সেগুলো নাকি এমনিভাবে দলিল দিয়ে লেখাপড়া করা যে কোনোকালে কেউ বেচতে পারবে না। বুড়ো-ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তা না হলে ওগুলোরও ল্যাজের ডগা বাকি থাকত না। অথচ মেজো কর্তাদাদামশাই নাকি মহা পাজি ছিলেন। পড়াশুনোর নাম নেই; দিনরাত পাড়ার যত ডানপিটে বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছোকরা জুটিয়ে, আজ এর পুকুরে মাছ মারা, কাল ওর আম বাগান সাফাই করা আর যেখানে যত কুস্তির আখড়া আর গান-কেত্তন, যাত্রা-নাটকের আস্তানায় গিয়ে পাল্লা দেওয়া। তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন ওদের দলকে দল নিখোঁজ হয়ে গেল। দুদিন একটু সোরগোল, মা-ঠাকুমাদের অল্প একটু আগসোস, তার পর গাঁয়ে এমনি

গভীর শান্তি বিরাজ করতে লাগল যে শোক-দুঃখ ভুলে দুবেলা সবাই শিবঠাকুরকে দুহাত তুলে ধন্যবাদ জানাত।

গাঁয়ের দেবতা বুড়ো-শিবতলার শিবঠাকুর। সেকালে প্রতি বছর পুজোর সময় ঘটা করে শিবতলায় আলাদা করে ঐ শিবঠাকুরের পুজো হত। 'শিবঠাকুরের বিয়ে' নাটক হত। গাঁয়ের মাতব্বররা অভিনয় করতেন। তাই নিয়ে মেজো কর্তাদাদামশাইয়ের কি রাগ। নারদের পার্ট কখনো ঐ আধবুড়োরা করতে পারে নাকি? নারদ সাজত কান্তি মোড়লের ঠাকুরদা জগা মোড়ল। সে কি নাচতে পারে, না গাইতে পারে? নারুদে চেহারা ছিল একটারও? মোটকথা মেজো কর্তাদাদামশায়ের নারদ সাজার বড় সখ ছিল। তিনি ফেরারি হবার পর তাই নিয়ে দু-চারজনাকে আক্ষেপ করতেও শোনা যেত। নাকি অদ্ভুত ভালো অভিনয় করতে পারতেন। চমৎকার দেখতে ছিলেন, খাসা গানের গলা ছিল আর নাচতেন যেন কার্তিকের ময়ূরটি। বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, মেজো কর্তাদাদামশাইয়ের কথা লোকে একরকম ভুলেই গেল। তাঁর কপালের মাঝখানে যে তৃতীয় নেত্রের মতো একটা বড় তিল জ্বল্‌জ্বল্ করত তা পর্যন্ত কারো মনে রইল না। তার মধ্যে আমাদের বাড়ির অবস্থা ক্রমে পড়তে পড়তে আর কিছুই রইল না। ঐ যে কান্তি মোড়লের কথা বললাম, তার ঠাকুরদা জগা মোড়লের তখন তেজারতি ব্যবসার ভারি বোলবোলা। আমাদের বাড়ির অর্ধেক জিনিসপত্র তারই কাছে বাঁধা দেওয়া, মায় আমাদের ও গ্রামের অর্ধেক লোকের জমিজমার দলিলপত্র সুদ্ধ। থেকে থেকে জগা বুড়ো ভয় দেখাত, টাকা শোধ না করলে সম্পত্তি অধিকার করবে।

এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, একদিন পুজোর সময় 'শিব-ঠাকুরের বিয়ে' নাটক দেখতে সকলে ব্যস্ত, এমন সময় জগা মোড়লের বাড়িতে ডাকাত পড়ল। তারা সিন্দুক ভেঙে গয়নাগাঁটি, আর তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, ইণ্টিলের ক্যাশ বাক্স বোঝাই বন্ধকী দলিলপত্র নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। আর কোনোদিনও তাদের টিকিটিও দেখা গেল না। জগা সেই যে শয্যা নিল, আর উঠল না। কিন্তু গ্রাম সুদ্ধ সবাই বুড়ো শিবঠাকুরকে বিশেষ পুজো দিয়ে এল। আমাদের সকলের জমিজমা বেঁচে গেল। ও-সব যে বাঁধা দেওয়া জিনিস তার কোনো প্রমাণই রইল না।

আরো কয়েক বছর পরে ঘোড়ার ডাকে মাসে মাসে আমাদের গাঁয়ের ফেরারি ছেলেদের সবার বাড়িতে পয়সাকড়ি আসতে লাগল। একবার আমার বুড়ো-ঠাকুমার নামে এক ছড়া মুক্তোর মালা আর একটি চিঠি এল। তাতে লেখা মেজো কর্তাদাদামশাই জাহাজে নাবিক হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নৌকোডুবি হয়েছিলেন। কিন্তু রাখে হরি মারে কে, একটা ভাসমান নারকেল গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে জোয়ারের জলের সঙ্গে তিনি একটা নির্জন দ্বীপে গিয়ে পড়লেন। দ্বীপের উপকূলে ঝিনুকের ছড়াছড়ি। একেকটা খোলেন আর ভিতর থেকে এই বড় একটা করে মুক্তো বেরোয়। খিদের চোটে পোকাটাকে খেয়ে ফেলেন আর মুক্তোটিকে কোঁচড়ে বাঁধেন। এমনি করে দুটি বছর কাটাবার পর আরেকটা জাহাজ তাঁকে উদ্ধার করে। মুক্তোর কথা কাউকে বলেন নি। দেশেও ফেরেন নি। কিন্তু পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে মুক্তো বেচার টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছেন। এর বেশি যেন কেউ আশা না করে। এখনো কি জগা মোড়ল নারদ সাজে? ইতি…

ঠাকুমা বললেন চিঠিটা যে জাল নয়, তার প্রমাণ চিঠির ঐ শেষের লাইনটি। নইলে, মেজো কর্তা কি আর লিখতে শিখেছিল যে অতবড় একখানা চিঠি ফাঁদবে। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছিল।

সেবার আমরা ঠিক করলাম 'শিবঠাকুরের বিয়ে' নাটক আমরা করব। হলদে হয়ে যাওয়া নাটকের পালার কপি খুঁজে বের করলেন ঠাকুমা। পোড়ো বাড়ির আগাছা কিছু পরিষ্কার হল, পুরোনো পুজোমণ্ডপ ঝাড়া ঝোড়াই হল, সেখানে সেকালে যেমন হত, সেইভাবে নাটক করা হবে। তবে বুড়োদের অভিনয় করতে দেওয়া হবে না। অনেক বছর পরে আবার ঘটা করে শিবতলার বুড়োশিবের পুজো হচ্ছে, বুড়োরা সেটা হাতে নিক কিন্তু নাটক করব আমরা। অর্থাৎ ছেলে-ছোকরারা। মেয়েদের পার্টও ছেলেরা করবে। গানের দলে মেয়েরা থাকবে। পয়সাকড়ি আমরা জোগাড় করলাম, কাজেই কেউ আপত্তি করল না।

সবই হল, খালি নারদের পার্ট করার লোক পাওয়া গেল না। নাচবে, গাইবে দেখতে ভালো হবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। শেষটা ঠাকুমাই বললেন, "আরে, আমার ভাগ্নী দুষ্টুর জামাই কৃষ্ণ কর কলকাতার নামকরা অভিনেতা। ওকে আনিয়ে নে না, যেমনি দেখতে তেমনি নাচে গায়। তোদের সবাইকে ওর পাশে একেকটা দাঁড়কাগের মতো দেখাবে।

বলিস তো আমিই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি।" দাঁড়কাগের কথাটাতে কেউ খুশি না হলেও, রাজি না হয়েও পারল না।

তাই ঠিক হয়ে গেল ; কৃষ্ণ কর নারদ সাজবে। তবে ব্যস্ত মানুষ, রিহার্সাল দিতে পারবে না। নাটকের এক কপি ওকে পাঠিয়ে দিলে, নিজেই তৈরি হয়ে নেবে। নাটকের দিন বঙ্কুদা ওকে গাড়ি করে নিয়ে আসবেন। আমবাগানের পিছনে বঙ্কুদাদের ছোট্ট অতিথিশালায় যেন ওর ড্রেস রেডি থাকে। ও সন্ধ্যার মধ্যে সাজ বদলে, নাটক শুরু হবার দশ মিনিট আগে মণ্ডপে উঠবে। কারো কারো একটু মন খুঁৎ খুঁৎ করলেও, বঙ্কুদা বললেন, "কৃষ্ণ করের কথার কখনো একচুল নড়ন-চড়ন হয় না।" তাইতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হল।

ষষ্ঠীর আগে বুড়োশিবের মন্দিরে পুজো হল। ষষ্ঠীর দিন নাটক হল। নিজেদের প্রশংসা করা উচিত নয় জানি, তবু সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হলাম যে অমন নাটক ইহলোকে খুব কম দেখা যায়। স্টেজ সাজানো, পার্ট মুখস্থ, ড্রেস্ পরা, সামিয়ানার নীচে লোক ধরে না। পুরোনো পুজোমণ্ডপ আমাদের বাড়ির লাগোয়া। গ্রীন রুমটা বাড়ির একতলার একটা ঘরে। তার একটা দরজা থেকে মণ্ডপে যাবার পথ, সেটা দরমা দিয়ে ঘেরা। আরেকটা দরজাও আছে, বাইরে থেকে যাওয়া আসার জন্য।

বিকেলেই বঙ্কুদা এসে জানিয়ে গেলেন, কৃষ্ণ কর এসে গেছেন। অতিথিশালায় বসে বঙ্কুদার সঙ্গে একবার মহড়াও দিয়েছেন। এখন বিশ্রাম করছেন, একেবারে সেজেগুজে স্টেজে উঠবেন। আমরা কেউ যেন ঝামেলা না করি। অনেকেই বলেছিল এ-সব চাল ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক অত নামকরা অভিনেতা বিনি পয়সায় অভিনয় করে যাচ্ছেন, সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

সন্ধ্যা এগিয়ে এল, সবাই রেডি। অথচ কৃষ্ণ করের দেখা নেই। আমার ভাই অমি বড্ড মোটা বলে তাকে কোনো পার্ট দেওয়া যায় নি। তার কাজ ছিল গ্রীন রুম আগলানো। শেষটা বঙ্কুদা তাকেই বললেন, "যা তো, একটু এগিয়ে দেখ। হয়তো অন্ধকারে আমবাগানে পথ হারিয়েছে। যা জঙ্গল তোমাদের বাড়িতে। আমরা এদিকে শুরু করে দিচ্ছি। প্রথম সীনে তো আর নারদ নেই।"

মণ্ডপের পেছনে প্যাঁ করে ক্ল্যারিয়োনেট বেজে উঠল, অমি আর আমি

কৃষ্ণ করের খোঁজে বেরুলাম। বেশি দূর যেতেও হল না, আমরা গ্রীন-রুমের দরজা খুলেই দেখি নারদের বেশে কৃষ্ণ কর সিঁড়ির ছোট ধাপটাতে দাঁড়িয়ে। কি ভালো দেখতে কি বলব। রঙ-টঙ মেখে মাথায় জটার ওপর জরির কাঁটা বেঁধে এমনি রূপ খুলেছিল যে সত্যিকার নারদ যদি একবার দেখতেন তো নিশ্চয় বলতে পারি হিংসায় জ্বলে যেতেন। সে কি রূপ। কপালে চিত্র করেছেন, সেটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। যাক সবাই নিশ্চিন্ত হল।

ততক্ষণে প্রথম সীন্‌ও শেষ হয়ে এসেছে, কৃষ্ণ করও আর বিলম্ব না করে মঞ্চপে উঠে পড়লেন। সে যে কি অদ্ভুত অভিনয়, যারা দেখেছিল সবাই একেবারে হাঁ! কৃষ্ণ কর নিজেও নাকি কখনো এত ভালো অভিনয় করেন নি। সীনের পর সীন হয়ে যেতে লাগল। কৃষ্ণ করের দেখাদেখি অন্য সকলেও বেজায় ভালো অভিনয় করতে লাগল। ইন্দ্রজালের মতো নাটক চলতে লাগল। দ্বিতীয় অঙ্কের পর আর নারদের পার্ট ছিল না। তাঁর শেষ সীন্‌টি এবার শুরু হবে, এমন সময় কৃষ্ণ কর অমিকে কানে কানে বললেন, "পেছনের দরজায় আমার শত্রু এসেছে। যেমন করে পার ঠেকাও, আমার পালাটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তার পর যা হয় হোক।" এই বলে তিনি মঞ্চপে উঠে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে যাবার ছোট দরজাতে আস্তে আস্তে কে টোকা দিতে লাগল। আমরা কেউ কান দিলাম না। অমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে কাকে যেন এক ধমক দিয়ে, আবার এসে বসল। জিজ্ঞাসা করাতে বলল, "ঢং করার জায়গা পায় নি, ব্যাটা, কলাপাতা জড়িয়ে সঙ সেজে, ভয় দেখাবার তালে আছে।" আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লোকটার দেখা পেলাম না।

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কর বিপুল হাততালিতে কানে তালা লাগিয়ে গ্রীনরুমে এসে অমিকে বললেন, "বাঃ ব্যাটাকে খুব ঠেকিয়েছ দেখছি। তোমার জন্য কি করতে পারি বল দিকিনি? বড় আনন্দ দিয়েছ। আচ্ছা, পুকুরটাকে সাফ করিয়ে একটু জল ছেঁচে ফেলার ব্যবস্থা কোরো।" এই বলে দরজাটা একটু ফাঁক করে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে শত্রু আছে বলে এতটুকু ভয় দেখলাম না।

অভিনয় শেষ হয়ে গেল। সবাই কৃষ্ণ করকে খুঁজতে লাগল। অথচ

তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না বঙ্কুদারা কয়েকজন শেষপর্যন্ত আমবাগানের অতিথিশালায় গিয়ে হাজির হলেন। দেখেন বাইরে থেকে তালা দেওয়া, যেমন কৃষ্ণ করকে বলে দেওয়া হয়েছিল। সবাই অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল "কে? কে? ওটা কে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে?"

সবাই মিলে তাকে হিড়্ হিড়্ করে টেনে আলোর সামনে আনতেই দেখা গেল কিম্ভূতকিমাকার এক মূর্তি, পরনে কলাপাতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, চোখে মুখে প্রচুর মেক্-আপ লেপটে রয়েছে। বঙ্কুদাকে দেখেই সে তাঁকে জাপটে ধরে বলল, "দাদা, এই বিপদে ফেলবার জন্যই কি আমাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন?"

বঙ্কুদার দু চোখ কপালে উঠে গেল। "সেকি! কেষ্ট, তুমি? তবে কে অভিনয় করে গেল?" লোকটা হতাশভাবে মাথা নাড়ল। "তা তো জানি না, আমবাগানের সব চেয়ে অন্ধকার জায়গায় ড্রেস্-ট্রেস পরে যেই পৌঁচেছি অমনি বাঘের মতো আমার ঘাড়ের উপর পড়ল। কোনো কথা বলল না, খালি আমার ড্রেস্ খুলে নিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কি করি, সেই ইস্তক কলাপাতা জড়িয়ে বেড়াচ্ছি এটা কি খুব ভালো কাজ হল?"

বঙ্কুদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "কি আশ্চর্য, নাহয় কলাপাতা পরেই গ্রীনরুমে যেতে। দরজাটা তো দেখিয়ে দিয়েছিলাম।" "গেছিলাম। কিন্তু একজন ষণ্ডামতো ভদ্রলোক এমনি তেড়ে এলেন যে পালাবার পথ পাই নে।"

"আহা, এখানে ফিরে এসেও তো অন্য কাপড় পরে গিয়ে আমাদের খবর দিতে পারতে। জাল নারদকে তা হলে ধরা যেত।" কী করে ঢুকব। দরজায় তালা দেওয়া, চাবিটা পাছে হারায় বলে মাথার ফাট্টার সঙ্গে সেপ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা। মাথার ফাট্টা তো তার মাথায়।"

সত্যি বলব কি, সবাই তাজ্জব বনে গেল। গোরু-খোঁজা করেও সে লোকটাকে পাওয়া গেল না। ড্রেস্ সুদ্ধ একেবারে হাওয়া। শেষপর্যন্ত তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে সবাই একেবারে থ'। ঘরের মেজেতে নারদের ড্রেস্ পড়ে আছে, যেন কেউ এইমাত্র ছেড়ে গেছে। মাথার জরির ফাট্টার সঙ্গে চাবিটা সেপ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা। অথচ দরজাটা বাইরে থেকে যেমন তালাবন্ধ করা হয়েছিল, তেমনি ছিল।

অনেক কষ্টে সেদিন কৃষ্ণ করকে ঠাণ্ডা করতে হয়েছিল। ঠাকুমা নিজে এসে তার পায়ে ধরাতে তবে তার রাগ পড়েছিল। পরদিন লোক ডেকে পুকুর ছাঁচা হল; কি জানি জলে ডুবে-টুবে গিয়ে থাকে যদি। কিচ্ছু উঠল না, শুধু রাশি রাশি মাছ আর কচ্ছপ, শ্যাওলা আর কয়েকটা সেকালের ঘটি ঘড়া আর ইস্টিলের একটা মকরের নকশা দেওয়া ক্যাশবাক্স। শ্যাওলা জমে তার দফা শেষ। ঢাকনা খুলতেই ভিতর থেকে কতকগুলো কাগজপত্র আর একটা হীরের কণ্ঠি মাটিতে পড়ল।

তাই দেখে আমার বুড়ো-ঠাকুমা বলে উঠলেন, "আরে, এযে বুড়ো-শিবতলার শিবঠাকুরের হারানো গলার কণ্ঠি। আমার শাশুড়ি বলতেন পুরুতঠাকুর ওটাকে সরিয়ে জগা মোড়লের কাছে বন্ধক দিয়ে গাঁজার পয়সা জোগাড় করেছিল।"

তখন সকলের খেয়াল হল। কে যেন বলল, "তাইতো, তাইতো, এই ভাঙা ক্যাশবাক্সটাও তবে বুড়োর সেই দলিলপত্রের হারানো ক্যাশবাক্স। তার উপরেও তো এইরকম মকর নকশা তোলা ছিল বলে শোনা যায়। আর ঐ পচা-ধচাগুলো তা হলে কি"—অমনি পাঁচজনে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল, "দূর, দূর, বাজে বকিস নে। আমাদের দলিল-টলিল ঠিক আছে।"

হীরের কণ্ঠিটাকে শুদ্ধি করে নিয়ে আবার শিবঠাকুরের মাথায় পরানো হল। সেই উপলক্ষে রাতে আমার ঠাকুমা সবাইকে খুব মাছ কচ্ছপ খাওয়ালেন। শোবার আগে বার বার বলতে লাগলেন "যাক্ যেখানকার যা সব ভালোভাবে শেষ হল। শিবঠাকুর তাঁর কণ্ঠি ফিরে পেলেন।"

বুড়ো-ঠাকুমা ফিক্ করে হেসে বললেন, "আর মেজো কর্তা-দাদামশায়ের নারদ সাজার সখও মিটল। ওর কাছে কৃষ্ণ কর। কিসে আর কিসে, সোনায় আর সীসে। কপালের মধ্যিখানে কালো কুচ্‌কুচে তৃতীয় নেত্রটি দেখেই আমি তাঁকে ঠিক চিনে ফেলেছি।"

তাই-না শুনে তিন-চার জন ধুপ্‌ধাপ্ মুচ্ছো গেল।

আকাশ পিদ্দিম

আকাশ পিদ্দিমটা জ্বেলে কাচের ডোমে পুরে বাঁশের ডগায় তুলতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। এ-পাড়ায় থেকে থেকেই বিজলি বন্ধ, কাজেই ছাদটা দিব্যি ঘুট্‌ঘুটে। চিলেকোঠার দোর অবধিও পৌঁছয় নি, পেছন থেকে খোলা গলায় কে ডাকল, "এ্যাই।" ফিরে দেখি পাশের বাড়ির ছাদে থুত্থুড়ে এক বুড়ি। মাথা থেকে পা অবধি সাদা কাপড়ে ঢাকা।

গুপে বলল, "আমাদের বলছেন?"

বুড়ি চটে গেল, "তোদের বলব না তো কাঁকে বলব রে ছোঁড়া? তোঁরা ছাঁড়া এঁখানে আঁছেটা কে? তাঁ ছাড়া তোঁরাই তো আঁলো দিলি।"

বক্কু বলল, "ইয়ে মানে ঠাকুমা বললেন সারা আশ্বিন মাস আলো দেখাতে হয়, তা হলে দেবতাদের নেমে আসতে সুবিধা হয়।"

"ও তাঁই বুঁঝি? তা আঁমিই বাঁ দেঁবতাদের চেঁয়ে কঁম কিঁসে শুঁনি? ওঁরা বঁর দেঁবে এঁই তাঁলে আঁছিস তোঁ? আঁমিও তো আঁলো দেঁখেই নেমেছি। অঁবিশ্যি দেঁখছি ভুঁল ছাঁদে নেঁমেছি, তাঁতে কি হঁয়েছে রে? তোঁরা তো তিঁনটে অঁঙ্ক দিলে দুঁটো ভুঁল কঁরিস। এঁখন বাঁজে কঁথা রেঁখে, কি বঁর চাঁস বঁল। নে, নে, তাঁড়াতাঁড়ি কঁর, আঁমার ঢেঁর কাঁজ।

গুপে, বক্কু, তোতা তাই শুনে হাঁ। তার পর গুপে বলল, "আমি দুটো স্টিলের পেনসিল-কাটা চাই।"

বক্কু বলল, "আমি একটা ভালো ডট্‌পেন আর ছটা রিফিল চাই।"

সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ি কোঁচড় থেকে দুটো স্টিলের পেনসিল-কাটা আর একটা ডট্‌পেন, আর ছটা রিফিল বের করে দিয়ে বলল, "নে, আঁলগোছে ধঁর, তোঁদের ছুঁলে আঁমাকে নাইতে হঁবে। বঁলিহারি, তোঁদের পঁছন্দ এঁইজন্য শুঁন্যি থেঁকে আমায় নাবানো! এঁ তো মঁটুর দোঁকান থেকে যেঁ কোনো সঁময় তুঁলে আঁনতে পাঁরতিস। আঁমিও তাঁই এঁনেছি। এঁকটা ভাঁলো বঁরও চাইতে জানিস না, স্টুঁপিড!"

তার পর তোতার দিকে ফিরে বলল, "বলি, ছোঁট খোঁকা, তুঁমিই-বা কেঁন চুঁপ ? ওঁদের মতো এঁকটা কিঁছু চাঁও।"

তোতা বলল, "বেশ, আমি আলাদীনের প্রদীপ চাই।"

বুড়ি ভয়ঙ্কর চটে গেল। "তোঁ-তোঁ-তোঁ—চাঁলাকি নাকি—আঁর কিঁছু চাঁ!"

তোতা বলল, "থাক্ তা হলে, কিছু দিতে হবে না। বুড়ি চোখ পাকিয়ে বলল, "দিঁতে হঁবে না আঁবার কি ? দেঁবতারা দিঁতে পাঁরে আঁর আঁমি পাঁরি না ? ঐ দ্যাখ, পিঁদ্দিমের নঁীচে!"

ওরা তাকিয়ে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে পিদ্দিমের বাঁশ বেয়ে সড়্সড়্ করে নীচে নেমে এল একটা টিনের টেমি বাতি। দেশের বাড়ির রান্নাঘরে যেমনি জ্বালায়, ঠিক তেমনি। ঠুং করে মাটিতে পড়তেই তোতা তুলে নিয়ে, ফিরে দেখে বুড়ি তখন অন্তর্ধান করেছে।

চিলেকোঠার আলোয় দেখা গেল পুরোনো লম্প, ঝুলকালি মাখা, কার রান্নাঘরে ব্যবহার হত কে জানে। তোতা সেটার গায়ে আঙুল ঘষতেই হপ্ করে খানিকটা আলো জ্বলে উঠল আর একটা বেঁটে বামুন দেখা দিয়ে বলল, "কি চাই মাস্টার ?"

তোতা অমনি বলল, "গুপেদার চেয়ে আরো বড় চারটে স্টিলের পেনসিল-কাটা, দুটো আরো ভালো ডট্পেন, আরো বারোটা রিফিল।"

বেঁটে বামুন পকেট থেকে চারটে বড় স্টিলের পেনসিল-কাটা, দুটো ভালো ডট্পেন আর বারোটা রিফিল বের করে তোতার সামনে মাটিতে ফেলে দিল। তোতা যেই-না নিচু হয়ে সেগুলো তুলতে যাবে, অমনি বেঁটে বামুন বলল, "একটা ভালো বরও চাইতে পারিস না, তুই এটার যোগ্য নোস!" এই বলে টেমিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্তর্ধান করল।

ওরা সখের জিনিসগুলি পকেটে পুরে গুটি গুটি নেমে এল, কাউকে কিছু বলল না।

চেতলায়

চেতলা, কালীঘাট, আদিগঙ্গা যতই পবিত্র স্থান হোক-না-কেন, ও-সব জায়গা মোটে ভালো না। আর লোকের মুখে মুখে কি-সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায় তার লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মশামাছি তো আছেই। চিল্‌তে চিল্‌তে সব গলি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরি ঝুর্‌ঝুরে সব বাড়ি, তায় আবার প্রায় সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। এক ফালি উঠোনের মধ্যে এই বড়-বড় সব গাছ, তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ; তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে যে কোনো বাড়ি থেকে যে-কোনো বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা, পুরোনো সব ঝগড়াও আছে তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্তা বন্ধ। মুখ-দেখা আর কি করে বন্ধ করে, নড়্‌বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই, সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে সবাই জানতে পারে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, চোর-ছ্যাঁচড়, খুনে দুষ্কৃতকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কি আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে, নেই-ও অবিশ্যি কারো কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড় কাকা ওখানকার থানার মেজো দারোগা। তা ছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইভ জন্মায় নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে 'মিসার হতাশা'। শুনে বড় মামা খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেলে তা হলে ওঁর হেড-আপিসে উন্নতি হয় কি করে? অবিশ্যি ও-সব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং ভয়ের, জিনিস আছে, ঐ তিনটে পাড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধে হতেই যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপর হাতে এক গোছা শঙ্কটতারিণী মাদুলী বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কারণ পুলিশে আর কিই-বা করতে পারে?

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিন দিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনি নি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে। কি বড়-বড় সবুজ রঙের চিংড়িমাছ নিয়ে একটা তাকে বিক্রি করতে এল। চিলেকোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট্-ঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, "না বাছা, এখানে ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ। বটু তো চটে কাঁই, কি ভালো ভালো চিংড়িমাছ। ছোট্-ঠাকুমা নেমে এসে বললেন, "ব্যাস্, মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল! আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অত বড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে পরে নেবে। বটু বলল "আহা, বলল যে বিক্রি না হলে পচে যাবে!"

কাষ্ঠ হেসে ছোট্-ঠাকুমা বললেন, "তুইও যেমন। তা ছাড়া ওগুলো মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে।" এই বলে ছোট্-ঠাকুমা জল খেতে বসলেন। বটুও বলল, "তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন কেমন মিচ্‌কে মতো দেখলি না।" আমি বললাম, "যাঃ! ভূতের হাঁটু উলটো দিকে থাকে আর ওদের ছায়া পড়ে না।" ছোট্-ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, "ইদিকে এখনো রোদ আসে নি বাবা, ছায়া দেখবি কি করে? সে যাই হোক, আদিগঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাস নে। জায়গাটা ভালো নয়।" গিজ্‌গিজে সব বাড়ি, বট-গাছ তলায় যেতে হলে সারকাস্ করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলার লট্‌খটে বারান্দায় দুজনে গল্প করছি। ছপ্ করে কি একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কি সুগন্ধ ভুর্-ভুর্ করতে লাগল। তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড়-বড় চিংড়িমাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি সেই মিচ্‌কে লোকটা মিট্-মিট্ করে হাসছে। মোটা মোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলার বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, "কে? কে ওখানে? সঙ্গে-সঙ্গে কেউ কোথাও নেই। খেয়ে ফেললাম দুজনে মিলে সব কটা চিংড়ি মাছ। যদি ওগুলো চিংড়িমাছ না-ও হয় তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকের উঠোনে আমগাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ।

ছোট্-ঠাকুমা সাদা পাথরের রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড়-বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে, ভক্তিভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট্-ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, "ব্রহ্মদত্তিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে—" আরো কি বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট্-ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, "অমন অছ্দ্ধা করিস নে, বটা। উনি আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বনাশ করবেন, খুশি রাখলে আমাদের জন্য না করতে পারেন এমন জিনিস নেই।" ঐ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে যে বছরে বছরে পাশ করে যাচ্ছিস্, সেটা কি করে সম্ভব সে কথা কখনো ভেবেছিস? হুঁঃ!" এই বলে ছোট্-ঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "তোরা বিশ্বাস না করতে পারিস, কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন আর তার বদলে একটি আশীর্বাদী—" আর বলা হল না কারণ সেই সময় বড় কাকা বাড়ি এলেন।

বড় কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় বললেন, "আর টেকা যাচ্ছে না। গোল-বাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।"

তাই শুনে বড় কাকি এমনি চমকে গেলেন যে হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে ফ্যাকশা মুখে বললেন, "কিন্তু—কিন্তু—" বড় কাকা কাঠ হাসলেন, "কিছু কিন্তু কিন্তু নয়। এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছটা ষণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে।"

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। নাকি ওটা চোরাচালানকারীদের গুহ্য আড়ত। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়ি-গঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে-আইনী জিনিস বস্তা বস্তা পাচার হয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায়, কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুতঠাকুর সেজে এটা-ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন। দিয়েছে নালিশ করে।

বড় কাকা বলেছিলেন, "লোকটাকে ধরা যায় না, ফুস্ফাস্ করে এখান দিয়ে ওখান দিয়ে গলে পালায়। কোনো দোকানদারের সঙ্গে ষড়্ও থাকতে পারে, শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কিরকম মিচ্কে

মতো, মোটা মোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল।"

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড় কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট্-ঠাকুমা তাঁর গলায় হলদে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যাস্, আর ভয় নেই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাস নে যেন। দুগ্গা! দুগ্গা!" বড় কাকা চলে গেলে বললেন, "কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঁঃ!"

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়ি-গঙ্গায় স্পষ্ট জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম। বটু বলল, "ঐ গোল-বাড়িটা আমার ঠাকুরদার অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল, লেখাপড়া শেখে নি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছধরার বাই ছিল আর চীনে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে চায়ের নেশা ধরেছিল। সুদিনে বাড়ির সব ঝাড়বাতি, আসবাবপত্র, রুপোর বাসন বেচে-বুচে সাফ করে দিল। ওর বুড়ি মা নাকি খুচরা পয়সাকড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজেছিল যে ব্যাটা খুঁজেই পায় নি—এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও-বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড় কাকা তদন্ত করতে। খুচরা টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটা তো বিয়েই করে নি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, গুঁটকো, কালো, চাকর-চাকর চেহারা। গেঞ্জি গায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়ি গঙ্গায় মাছ ধরত—কে? কে ওখানে?"

খচ্‌মচ্ করে তালগাছ থেকে আমগাছ, আমগাছ থেকে নড়্‌বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচ্‌কে লোকটা হাসি হাসি মুখ করে উঠে এসে, নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "চা চা গন্দ পাচ্চি মনে হচ্ছে।" সত্যিই ছিল চা-দোকানের কেতলিতে একটু চা, একটা মাটির ভাঁড়, বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে নামতেও হয় নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রোজকার মতো। চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচ্‌কে মুখ যেন ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম, "পেঁয়াজি খাবে নাকি?" জিব কেটে বলল, "এ্যা, ছি ছি, ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজকার মতো খেয়ে এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর, মেওয়া—" বটা আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না।

মিচ্‌কে লোকটি বলল, "বড়-কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে টিকতে না পেরে ওনার এখানে গা-ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্যি রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।"

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "কেন চলে যাবে? এখানে বুঝি খেতে পাও না?" ফিক্ করে হেসে মিচ্‌কে লোকটা বলল, "দু বেলা নৈবিদ্যি পাই আবার কষ্ট কিসের। ঐ এল বলে। আমি উঠি।" বলেই হাওয়া। নীচে বড় কাকাদের রাগ-রাগ গলায় হাঁক ডাক শোনা গেল, নিশ্চয় কিচ্ছু দুষ্কৃতিকারী-টারি ধরতে পারেন নি। সঙ্গে-সঙ্গে হুড়্‌মুড়্ করে আদ্যি-কালের তালগাছটা ভেঙে পড়ল। পোকা ধরা, পুরোনো গুঁড়ি ভেঙেচুরে একাকার। তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরোনো টাকাকড়িতে তার অর্ধেক ভরতি। আর চাঁচাপোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা, তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড় কাকার রাগ ঠাণ্ডা।

পর দিন বড় কাকা বললেন, "আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ি ঠাকরুন তা হলে বাউণ্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য, এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।"

ছোট্-ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, "কত বাঁচিয়ে ছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।" ফোঁৎ ফোঁৎ করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড় কাকা তো অবাক।

পিল খানা

মন-টন খুব খারাপ। তা আর হবে না? পুজোর সময়ে হাওড়ার এই গলিতে আটকা আছি। আটকা কেন, একরকম বলতে গেলে কয়েদি আসামী হয়েই আছি। জেলখানার বন্দীরাও এর চেয়ে খারাপভাবে থাকে না। বেরুতে দেয় না, কথা বলবার লোক নেই, দেয়ালের ঐ ছোট চার কোনা জানলাটা খুলে দিনে তিনবার আমার খাবার ঢুকিয়েই, আবার দড়াম্ করে বন্ধ করে দেয়, পাছে আমার গায়ের জল-বসন্তের

বীজ ওদের গায়ে লেগে যায়। বাড়িতে তো দেখে এলাম, মা রোজ রাতে বুল্টির সঙ্গে এক খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

নাকি আমার পড়ার ব্যাঘাত হতে পারে। গায়ে শুটি শুটি মতো বেরুলে পড়ার কী করে ব্যাঘাত হয় বুঝলাম না। আর পুজোর ছুটিতে কেউ পড়ে নাকি? তা কে শোনে। অমনি বলা নেই কওয়া নেই, আমাকে বগল-দাবাই করে এনে খুড়ো-দাদু এইখানে পুরেছে। কী খারাপ খেতে দেয় কী বলব। সবটাতে তেঁতুল-গোলা। তা হলে নাকি জল-বসন্ত হয় না। যত সব বাজে কথা।

এখন সন্ধে হয়ে গেছে, আজ ষষ্ঠী, দূরে কাদের বাড়িতে পুজো হচ্ছে, কাছেও পুজো হচ্ছে, সব জায়গায় হচ্ছে, বাজনা বাজছে। কিচ্ছু দেখতেও পাচ্ছি না। আমার জানলার নীচের গলিটা আসলে এই বাড়ির নিজস্ব গলি। বেশ চওড়া। ও দিকের বাড়ির সব জানলা ইঁট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করা। নাকি একশো বছর আগে দুই শরিকে হাতি ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। সায়েব হাকিম এসে এই ব্যবস্থা করেছিল। তাই ওদের নাকি এখনো রাগ আছে, বলে সায়েব ঘুষ খেয়েছিল। এদের সঙ্গে কথা বন্ধ।

এই বাড়িটা নাকি দুশো বছরের পুরোনো। এই পাড়াটাই দুশো বছরের হবে, খোলা খোলা নর্দমা, রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতে সিঁড়ি দিয়ে না-উঠে, এক ধাপ করে নামতে হয়। সেদিন খুব বৃষ্টি হল আর রাস্তার সব জল সক্কলের বাড়ির একতলায় গিয়ে জমা হল। জিনিসপত্র সব উঁচু-উঁচু তক্তপোষে তোলা, পা উঠিয়ে বসে যে যার কাজ করে যেতে লাগল, কারো কোনো অসুবিধা হল না। দুশো বছরের অভ্যেস। বাড়িতে এই সময়ে আমরা খাই। গরম গরম হাতরুটি করে দেয় পিসিমা, আমরা ছক্কা দিয়ে আলুরদম দিয়ে খাই। তার পর একটা বড় কলা, কিম্বা আম, কিম্বা আতা খাই। এই গলিটার ভিতর দিকে একটা আতাগাছ দেখতে পাই, তাতে বড়-বড় আতা পেকেছে। মা থাকলে···। যাক গে আমার এগারো বছর বয়স হয়ে গেছে, আজকাল আমি আর কাঁদি-টাদি না। কিন্তু এরা রাতে আমাকে চিনি না-দিয়ে দুধসাবু দেয়, তা নইলে নাকি আমার জল-বসন্ত হবে। সে কখন খাওয়া হয়ে গেছে, আবার আমার খিদে পেয়েছে।

আমি আসবার আগে পিসিমা বলেছিল এটাই নাকি আমাদের

পৈতৃক বাড়ি। দুশো বছর ধরে আমরা সবাই এখানেই জন্মেছি, এখানেই মরেছি। ভাব একবার। একতলার ছাদ বেজায় নিচু, কিন্তু দোতলা-তিনতলার ছাদগুলো এমনি উঁচু যে রাতে ভালো করে দেখা যায় না। দেয়ালে লাগানো-আলো অতদূর পৌঁছয় না। যা-কিছু ওখানে আঁকড়ে-মাকড়ে ঝুলে থাকতে পারে, তার পর এক সময় সুবিধা বুঝে ঝুপ্ করে আমার ওপর প'লে, আগে থাকতে আমি টেরও পাব না। এ ঘরের সঙ্গে লাগা স্নানের ঘর। ঘরের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া থাকে। নইলে বাড়ির অন্য ছেলেদের মধ্যে দিয়ে রোগ ছড়ায়। খুড়ো-দাদু একবার করে এসে আমাকে পড়ায়। রাতে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়, গলিতে বাতি নেই। ছিল একসময় নিশ্চয়, দেয়ালে মস্ত একটা ব্র্যাকেট গাঁথা ছিল। রাতে আমার ভয় করে ঘুম ভেঙে যায়। বলেছি না। মন-টন খুব খারাপ। বাবাকে একটা চিঠি লিখতে পারলে হত। এই আলোতেই লিখতে পারতাম, যদি একটা পোস্টকার্ড পেতাম।

আমার আবার কম মন খারাপ হলে ঘুম আসে না, বেশি মন খারাপ হলে বেজায় ঘুম পায়। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম প্রায় কারিকুরি-করা উঁচু খাটটার ওপর, এমন সময় মনে হল কোথায় টুংটাং করে আস্তে আস্তে অনেকগুলো ঘণ্টা বাজছে আর নাকে এল কেমন একটা অদ্ভুত জানোয়ার-পানা গন্ধ। নিশ্চয়ই বুড়ো চৌধুরী এ-বছর পুজোয় যাত্রার বদলে সারকাসের ব্যবস্থা করেছেন। আমাকে অবিশ্যি কোনোটাই দেখতে দেবে না। এক যদি বাবা কোনোরকমে টের পেয়ে—নাঃ, শব্দটা বড্ড বেশি কাছে এসে পড়েছিল।

অমনি উঠে পড়ে ছুটে গেলাম জানলার কাছে। বাইরে তাকিয়ে আমার চক্ষুঃস্থির। একটা-দুটো নয়, গলি দিয়ে একটার পর একটা কুড়িটা হাতি আসছে, প্রত্যেকের ঘাড়ে মাথায় ফাট্টাবাঁধা মাহুত আর গলায় ঘণ্টা। দেয়ালের পুরোনো ব্র্যাকেটে কে একটা সেকেলে লণ্ঠন ঝুলিয়েছিল, তারই আলোতে হাতিগুলো সাবধানে এগুচ্ছিল, পা-ফেলার কোনো শব্দ হচ্ছিল না, কিন্তু গলার ঘণ্টাগুলো একটু একটু দুলছিল, তাই শব্দ হচ্ছিল।

"হেই। হেই!" প্রথম হাতিটা আমার জানলার নীচে পৌঁছেই থেমে গেল। এ-বাড়ির একতলাটা এত নিচু আর হাতিটা এত উঁচু যে, মাহুত আর আমি একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেলাম। দেখলাম বুড়ো-

মতো, গায়ে গেঞ্জি, কানে মাকড়ি। চোখোচোখি হতেই সে বলল, "ও কী। চোখে জল কেন ছোটকর্তার? কেউ কিছু বলেছে?"

আমি চোখ মুছে বললাম, "জল কোথায়? ও তো ঘাম বেরুচ্ছে। আমার খিদে পেয়েছে।"

লোকটা হাসতে লাগল, "খিদে পেয়েছে তো হুকুম করুন। চোদ্দো-পুরুষের গোলাম হাজির থাকতে ভাবনা কী? এই মোতি, কী নিয়েছিস মোড়ের মাথার বাগান থেকে, দিয়ে দে বলছি।"

হাতিটা শুঁড় তুলে আমার কোলে এই বড়-বড় দুটো পাকা আতা দিয়ে চোখ মিট্‌মিট্ করতে লাগল, ঠিক যেন হাসি পেয়েছে।

আমি খুশি হয়ে বললাম, "তোমরা বড় ভালো। তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসছ?"

সে বলল, "আমি হাইদার, ছোটকর্তা, ঐ যে গলির ও মাথাটা এখান থেকে দেখা যায় না, ঐখানে আমাদের পিলখানা। সেখানে কুড়িটা হাতি থাকে। রোজ এই সময় বড় পুকুরে জল খাওয়াতে নিয়ে যাই। এই সময় পথঘাট ফাঁকা থাকে। দুটো-একটা হাতি আছে ভীড় দেখলে এখনো ঘাবড়ায়। এরা সব বর্মী হাতি কিনা, আগে কখনো শহর দেখে নি। এবার চলি, কেমন? আতা ধুয়ে খেও, মোতি শুঁড়ে করে এনেছে তো।"

আমি বললাম, "কাল আবার আসবে তো?"

হাইদার বলল, "রোজ রোজ আসব, এই সময়। তুমি কিন্তু মন খারাপ কোরো নি। পালঙ্কের তলায় ঐ কাঁঠাল-কাঠের তোরঙ্গটা খুলে দেখ-না কেন, তোমাদের চোদ্দো পুরুষের জমিয়ে রাখা কত মজার মজার জিনিস আছে ওতে।"

আমি বললাম, "তাই নাকি? কেউ কিছু বলবে না তো?"

হাইদার বলল, "তোমার জিনিস তুমি হাঁটকাবে, কে আবার কী বলবেটা শুনি? এই বাড়িতে একশোটা ঘর, একশোটা শরিক। এ-ঘরটা তোমাদের তা জানতে না?"

হাতির সারি চলতে শুরু করল, গুনে দেখলাম মাঝে-মাঝে একটা করে বাচ্চা হাতি, সব নিয়ে কুড়িটা। আতা দুটো ধুয়ে খেয়ে ফেললাম। কী ভালো যে কী বলব।

হাতিটা শুঁড় তুলে আমার কোলে এই বড়-বড় দুটো পাকা আতা দিয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল, ঠিক যেন হাসি পেয়েছে।

পরদিন সকালে উঠে গলি দেখে বুঝবার জো ছিল না যে, রাতে ওখান দিয়ে কুড়িটা হাতি গেছে। তারা কখন ফিরেছিল, কে জানে। লণ্ঠনটাকেও দেখলাম নামিয়ে রেখেছে। একবার ভাবলাম খুড়ো-দাদুকে হাতির কথা জিজ্ঞাসা করব। তার পরই মনে পড়ল বুড়ো চৌধুরীর সঙ্গে খুড়োদের একশো বছর কথা বন্ধ। তাদের ভাড়া করা হাতি রাতে খুড়োদের গলি দিয়ে খুড়োদের বড় পুকুরে জল খেতে যায় শুনলে খুড়ো তো রেগে চতুর্ভুজ হবেন, তার ওপর হয়তো এ পথটাও বন্ধ করে দেবেন। তা হলে হাইদারের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

ভারি খিট্‌খিটে খুড়ো-দাদু, হাতির কথা তাঁকে কোনোমতেই বলা যায় না। তবু পড়তে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "গলির ও-মাথায় কারা থাকে খুড়ো-দাদু?"

বেজায় রেগে গেলেন, "তোর তাতে কী দরকারটা শুনি? পড়াশুনোয় মন নেই, কেবল চার দিকে চোখ।" বলে এমনি হাঁড়িমুখ করে বসে রইলেন যে, আমি তখন কিছু বলতে সাহস পেলাম না।

উনি চলে যাবার সময় শুধু বললাম, "একটা পোস্টকার্ড দেবেন খুড়ো-দাদু? বাবাকে একটা চিঠি লিখব।"

"ওঃ! আমার বাপের ঠাকুরদা এলেন। যা খবর নেবার আমিই নিয়ে থাকি। সবাই ভালো আছে। তাই নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

বললাম, "বাইরে থেকে ছিটকিনি দেবেন না। আমি বেরোব না।" খুড়ো-দাদু বললেন, "তার পর নিখোঁজ হয়ে গেলে তোর বাবাকে কী বলব শুনি?" এই বলে বাইরে থেকে ছিটকিনি দিয়ে চলে গেলেন।

দুপুরে খাটের তলার তোরঙ্গটা টেনে বের করে খুললাম। আশ্চর্য সব জিনিসে ভরতি। পুরোনো বাঘবন্দী খেলার ছক-কাটা বোর্ড, রবার-ছেঁড়া গুলতি, হলদে হয়ে যাওয়া পড়ার বই, ছেঁড়া কাপড়-চোপড়। আমার একটা ফোটো। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার এত পুরনো ফোটো কি করে হবে? পিছনে আমার মতো হাতে লেখা মনি রায়। বাবার নাম। তা হলে বাবার ফোটো। এ-ঘরে বাবা কি ছোটবেলায় থাকতেন? সারাদিন বসে অনেক পড়াশুনো করে ফেললাম।

কী করে বাবাকে একটা চিঠি লেখা যায়?

সন্ধের আগেই আমার দুধসাবু পৌঁছে দিয়ে, খুড়ো-দাদুরা সপ্তমী

পুজো দেখতে গেলেন। তখন আমি জানলার কাছে বসে খুব খানিকটা কেঁদে নিলাম।

"হেই! হেই!—এই দেখ! এ কী কাণ্ড!"

মুখ তুলে দেখি একেবারে নাকের সামনে হাইদারের মুখ। আজ মোতি হাতিকে কিছু বলতে হল না, শুঁড় বাড়িয়ে নিজের থেকেই আমার হাতে আতা গুঁজে দিল। ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম কী নরম, কী মোলায়েম। মোতি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মিট্ মিট্ করে হাসতে লাগল। তার পিছনে হাতির সারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল।

হাইদার বলল, "কী হয়েছে বলবে নি?"

অমনি তাকে সব কথা বলে ফেললাম। শুনে হাইদার একটুক্ষণ চুপ করে বলল, "পোস্টকাট আবার কী?"

মুখ্যু বেচারি পোস্টকাট জানে না। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা বাড়িতে চিঠি লেখ না? তাকেই বলে পোস্টকাট।"

হাইদার বলল, "চিঠি? "চিঠি কে নিয়ে যাবে কর্তা? বছরে একবার নিজেই চিঠি হয়ে চলে যাই। কিন্তু তোমার জন্য তো একটা কিছু করতে হয়। আচ্ছা যদি ঘর থেকে ছেড়ে দিই, একা-একা বাড়ি যেতে পারবে?"

"খুব পারব, নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু ওরা তো সদর দরজায় তালা দিয়ে গেছে, কী করে খুলবে?"

হাইদার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "শুনলি তো মোতি? কই, লাগা দিকিনি! জানলা থেকে সরো কর্তা!"

সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল মোতি হাতি হাঁটু দিয়ে একতলার দেয়ালটা একটু ঠেলে দিল, আর অমনি পড়্-পড়্ মড়্-মড়্ করে দেয়াল ভেঙে, জানলা ভেঙে, নীচের রাস্তা অবধি দিব্য একটা সাঁকোর মতো হয়ে গেল। আমি আর অপেক্ষা করলাম না, অমনি পড়ার ব্যাগটা বগলে পুরে এক দৌড়ে নেমে এলাম। হাতির লাইন সুদ্ধু হাইদার ততক্ষণে হাওয়া। কোথাও ওদের দেখতে পেলাম না।

আমি ছুটে মোড়ের মাথায় গিয়ে বাস ধরলাম। যখন বালিগঞ্জে আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন হয়তো রাত নটা, বাবাদের খাবার দিচ্ছিল। আমাকে দেখে বাবার চক্ষু চড়কগাছ। মা হয়তো বকবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন, আমি ছুটে গিয়ে বাবার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে-কেটে একাকার করলাম।

আমার গলার আওয়াজ শুনে বুল্টিও ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিছুতেই আর গেল না, বলল, "আমি সেরে গেছি, কেন যাব ?" বলে হাউমাউ করে সেও বাবার কোলে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিল। ভারি ছিঁচকাঁদুনে হয়েছে মেয়েটা।

ঠিক তখনি আমাদের জন্য পুতুল, হকি-স্টিক, বেলুন, মুড়ি-ল্যাবেঞ্চুশ, শোনপাপড়ি নিয়ে জ্যাঠামশাই এলেন। আমরা বাবার গেঞ্জিতে চোখ-টোখ মুছে ফেললাম।

অনেক রাতে বাবার পাশে শুয়ে ঘরে বন্ধ থাকার কথা, হাইদার আর মোতি হাতির কথা বাবাকে বললাম।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, "তোর জ্যাঠামশাই যখন তোর মতো, আমি একটু ছোট, আমাদের মা-বাবা বর্মা থেকে আসার পথে জাহাজসুদ্ধ নিখোঁজ হয়ে যান। ঐ ঘরে আমরাও মাস তিনেক ছিলাম। বড় দুঃখেকষ্টে ছিলাম রে। তখনো রোজ রাতে হাইদার আসত, হাতির সারি নিয়ে। আমাদের ফল-টল খেতে দিত। একদিন হঠাৎ বলল কাল তোমাদের মা-বাবা আসবে দেখো। ওমা, সত্যিই তাই। ঝড়ে পড়ে জাহাজ আসতে দেরি হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল জাহাজডুবি হয়েছে। আরো কিছুদিন ছিলাম ঐ বাড়িতে, কিন্তু হাইদার আর হাতিরা আর আসে নি।"

আমি বললাম, "তোমরা কেন গলি দিয়ে পিলখানায় গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলে না ?"

বাবা আস্তে-আস্তে বললেন, "পিলখানা ? পিলখানা কোথায় পাব রে ? সে তো আরো একশো বছর আগেই ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল।"

বললাম, "আর দেখো নি, বাবা ?"

বাবা বললেন, "না রে শুধু দুঃখী লোকেরা ওদের দেখতে পায়।"

গোলাবাড়ির সার্কিট হাউস

যারা শহরে বাস করে তারা দু চোখ বুজে জীবনটা কাটায়। কোনো একটা বিদেশী তেল কোম্পানির সব থেকে ছোট সাহেব অরূপ ঘোষের মুখে এ কথা প্রায়ই শোনা যেত। সাহেব বলতে যে বাঙালী সাহেব বোঝাচ্ছে, আশা করি সে কথা কাউকে বলে দিতে হবে না। বিলিতি বড় সাহেব আজকাল যদি-বা গুটিকতক দেখা যায়, ছোট সাহেব মানেই দিশি! তবে অরূপের বুকের পাটাও যে কারো চেয়ে নেহাত কম, এ কথা তার শত্রুরাও বলবে না।

সমস্ত বিহার, ওড়িষ্যা আর পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে অজস্র গাড়ি চলার ভালোমন্দ পথ আর অগুন্তি রাত কাটাবার আস্তানা আছে, এ বিষয়ে যারা ও-সব জায়গায় না গিয়েছে, তাদের কোনো ধারণাই নেই। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার গল্প বলে তারা। বিশেষ করে কোনো নির্জন আস্তানায় দু-চার জনা যদি অতর্কিতে একত্র হয়। সেদিন যেমন হয়েছিল। বলাবাহুল্য অরূপ ছিল তাদের একজন।

বিদেশী তেল কোম্পানীর ছোট বড় সাহেবদের তিন বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি চড়ে বেড়ানো নিতান্ত নিন্দনীয়। কাজেই অরূপের গাড়িটা খুব পুরোনো ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি, দুর্ভোগ কপালে থাকলে তাকে এড়ানো সহজ কথা নয়, কাজেই এই আস্তানায় পৌঁছতে শেষ বারো মাইল আসতে, তার দেড় ঘণ্টা লেগেছিল এবং পঁচিশবার নামতে হয়েছিল। ফুয়েল পাম্পের গোলমাল, সেটি না সারালেই নয়। অথচ ক্ষুদে অখ্যাত বিরামাগারের সামনের নদীর মাথায় কোথাও প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে থাকবে, তার ফলে নদী ফেঁপে ফুলে একাকার। পুরোনো লড়ঝড়ে পুল থরহরি কম্পমান। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক ছাড়া কেউ তাতে চড়তে রাজি হবে না।

তবে এর চাইতে অনেক মন্দ জায়গাতেও রাত কাটিয়েছে অরূপ। সেই কথাই হচ্ছিল। ম্যানেজার ছাড়া, শুধু একটা চাকর। তা ছাড়া তিনজন আগন্তুক; অরূপকে নিয়ে চারজন। ম্যানেজার মানে

কেয়ার-টেকার। এখানে কেউ থাকেও না, খায়-দায়ও না। হয়তো দৈবাৎ অসুবিধায় পড়লে রাত কাটিয়ে যায়। নিজেদের খাবার-দাবার খায়।

বনবিভাগের ইন্সপেক্টর কাস্ত্রো সাহেব ডি-সিল্‌ভা বলল, "আরে তোমরাও তো খাও-দাও, ঘুমোও।" তা খায় সত্যিই। কেয়ার-টেকার খৃশ্চান; যে বেয়ারা রাঁধে সে কেয়ার-টেকারের হুকুম পালে বটে; কিন্তু তার হাতে খায় না। নদীর ওপারে মাইল দেড়েক দূরে রবি গাঁও থেকে রসদ কিনে আনতে হয়। আজ আর কেউ নদী-পার হতে পারে নি। ভাঁড়ার ঠন্‌ঠন্। তা ছাড়া এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর যে-কেউ এসে উঠলেই অমনি তার নফর হতে হবে, এমন যেন কেউ আশা না করে।

ডি-সিল্‌ভা পরিষ্কার বাংলা বলে, তার আদি নিবাস ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। এবার সে রেগে উঠল। "মাই ডিয়ার ফেলো, আমি তোমাদের মতো নই, আমি ইউরোপিয়ান, তোমাদের রাঁধাবাড়ার তোয়াক্কা রাখি না। আমার রসদ আমার সঙ্গে থাকে। আমি শুধু জানতে চাই এ জায়গাটা রাত কাটাবার পক্ষে নিরাপদ কি না।"

অরূপ না হেসে পারল না। "বনের মধ্যে যার কাজ তার অত ভয় কিসের?"

তৃতীয় ব্যক্তির নাম নমসমুদ্রম কি ঐ ধরনের কিছু। বোধ হয় পুলিশের লোক। ডি-সিল্‌ভার সঙ্গেই এসেছিল। সে সর্বদা ইংরেজি ছাড়া কিছু বলে না। এবার সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "না, না, সেরকম ভয়ের কথা হচ্ছে না! আর হবেই-বা কেন? তোমাদের মতো উৎসাহী ইয়ংমেন তো এ-সব বনের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ বন্য জন্তু মেরে-কেটে সাবাড় করে এনেছে! ও অন্য ভয়ের কথা বলছে।"

অরূপ জুতোর ফিতে ঢিলে করে, মোজাসুদ্ধ পা টেনে বাইরে এনে, আঙুলগুলো নেড়ে একটু আরাম বোধ করে বলল, "তা হলে কিরকম ভয়ের কথা মশাই?" সে তেল কোম্পানির কর্মী, রাষ্ট্রভাষা তার মুখে সহজে আসে। শুনে চতুর্থ ব্যক্তি দাড়ি নেড়ে বলল, "ঠিক, রাইট।" নমসমুদ্রম কাষ্ঠ হাসল—"এমন সব ভয়ের ব্যাপার যা বন্দুকের গুলিতে বাগ মানে না। ঠিক কি না?" ডি-সিল্‌ভা বলল, "অবিশ্যি আমার তাতে এসে যায় না। ইউরোপের লোকেরা এ-সব

বিষয়ে অনেকটা উদার। তা ছাড়া আমার পীরের দরগায় মানত করা আছে। আমার ক্ষতি করে কার সাধ্যি।"

সরদারজি বললেন, "তবে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে বৈকি। এই যেমন গত বছর সবাই গই-গই করে বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের ট্রাক দুর্ঘটনার অকুস্থলে যাবার পথে মোপানির ডাক-বাংলায় রাত কাটালাম। বেশ ভালো ব্যবস্থা, আমার ডালরুটি আমার সঙ্গে থাকে, চৌকিদারটিও ভদ্র। আমার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আর স্নানের ঘরে জল আছে কি না অনুসন্ধান করেই সে হাওয়া হয়ে গেল। আমিও ক্লান্ত ছিলাম, মনে যথেষ্ট দুর্ভাবনাও ছিল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতে উঠতে গিয়ে খাটের পাশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে, ও হরি, তল পাই না। কিছুতেই আর মেজেতে পা ঠেকল না। নামাও হল না। কখন আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি যে-কে সেই। খাটের পাশে ঐ তো চটিজোড়া রয়েছে, কেউ ছোঁয়ও নি। ভালো করে ঘরটা পরখ করলাম, কেউ যে দড়ি বেঁধে কি অন্য উপায়ে খাটটাকে শূন্যে তুলবে, তার কোনো চিহ্ন নেই। ভাবলাম দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কাপড়-চোপড় পরে চায়ের জন্য বসে বসে হয়রান হয়ে, চৌকিদারের ঘরে গিয়ে তাকে টেনে বের করলাম। আমাকে দেখে সে অবাক। 'সাহাব, আপনি—আপনি—! ও বাংলোতে তো কেউ রাত কাটায় না। কাল সেই কথাই বলতে চেষ্টা করছিলাম, আপনি কানও দিলেন না।'

"হাসলাম। আমার কনুই-এর ওপর কালীঘাটের মাদুলী বাঁধা সে কথা আর ব্যাটার কাছে প্রকাশ করলাম না। অবিশ্যি বলা বাহুল্য জায়গাটার নাম মোপানি নয়। সরকারের ক্ষতি করতে চাই না বলে নামটা পাল্টে দিলাম।"

নমসমুদ্রম বলল, "ডি-সিল্‌ভার আর আমার গত বছর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তরাইয়ের এক চা বাগানে এক বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। বাগানও দেখব, ডি-সিল্‌ভা কি-সব গাছের নমুনা সংগ্রহ করবে আর আমার একটা তদন্তের কাজও ছিল। সন্ধে থেকে চা-বাগানে কেমন একটি অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম। অন্ধকারের আগেই আপিস-সেরেস্তার কারখানা-গুদোমখানার দরজা-জানলা দুম্‌দাম্‌ বন্ধ হয়ে গেল। কর্মীরা যে যার কোয়ার্টারে দোর দিল।

অথচ এখানে এমন কিছু একটা শীত পড়ে নি। আকাশে ফুট্‌ফুট্‌ করছে চাঁদ। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে, চা-বাগানের মালিকও নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। আমাদের বললেন, 'শুয়ে পড় তোমরা, এ সময়টা এ-সব জায়গায় খুব ভালো নয়। শিকার? কাল সকালে ভালো শিকারের বন্দোবস্ত করেছি।' কিন্তু এত সকালে শোব কি! বন্দুক নিয়ে দুজনে বাথরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

"চা-বাগান গিয়ে ঘন বনে মিশেছে। মাঝখানে শুধু একটা উঁচু সেতু। সেটা পেরুনো আমাদের কাছে কিছুই নয়। পূর্ণিমায় কখনো বনের মধ্যে বেড়িয়েছেন? চাঁদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে কুচিকুচি হয়ে, এখানে ওখানে পড়ে, হীরের মতো জ্বলে। কোথাও অন্ধকার জমে থক্‌-থক্‌ করে। মনে হয় গাছগুলো জেগে উঠে চোঁখ মেলে চেয়ে দেখছে। গা শির্‌শির্‌ করে। কোথাও সাড়া-শব্দ নেই।

"হঠাৎ দেখি আমাদের থেকে দশ হাত দূরে প্রকাণ্ড নেকড়ে বাঘ। এত বড় নেকড়ে এ-দেশে হয় জানতাম না। তার চোখ দিয়ে আলো ঠিকরোচ্ছে, মুখটা একটু হাঁ করা, বড়-বড় দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা ঝরছে। মাথাটা একটু নিচু করে, বিদ্যুৎবেগে সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আর গায়ের চাপে ঝোপ-ঝাপগুলো সরে সরে যাচ্ছে।

"আমার সারা গা হিমের মতো ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেল। বন্দুক তুলবার জোর পাচ্ছিলাম না। অথচ ডি-সিল্‌ভা নির্বিকার। যেই জানোয়ারটা আমাদের পার হয়ে গেল, মনে হল এমন সুযোগ আর পাব না। অমনি সম্বিৎ ফিরে এল। বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপলাম। খুব বেশি হলে জন্তুটা তখন আমাদের কাছ থেকে সাত-আট হাত দূরে। আমার অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলিটা তার গা ফুঁড়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন একটা গাছের গায়ে সেটাকে বিঁধে থাকতে দেখা গেছিল।

"নেকড়েটা ভ্রূক্ষেপও করল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি নিমেষের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার কেমন মাথা ঘুরে গেল, ডি-সিল্‌ভা না ধরলে পড়েই যেতাম।" অরূপ বলল, "ভারি অদ্ভুত তো!"

ডি-সিল্‌ভা চুপ করে শুনছিল। এবার সে মুখ থেকে সিগারেট বের করে বলল, "অদ্ভুত বললে অদ্ভুত! আমি তো ওর পাশে দাঁড়িয়েও নেকড়ে-ফেকড়ে কিছু দেখলাম না, খালি একটা বুনো গন্ধ নাকে এল। একফোঁটা রক্তও মাটিতে দেখা গেল না। পরদিন ভোরে বাগানের মালিক শিকারের প্ল্যান বাতিল করে দিয়ে, একরকম জোর করেই আমাদের রওনা করে দিলেন। খুব বিরক্ত মনে হল। তবে এ-সব ব্যাপারে কোনো এক্সপ্ল্যানেশন খুঁজবেন না, মশাই। নেহাত সমুদ্রের মা গুরু-বংশের মেয়ে, নইলে আর দেখতে হত না।"

অরূপ খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। এদের যত সব গাঁজাখুরি গল্প। ইণ্টেলিজেন্সের অপমান। ডি-সিল্‌ভা বলল, "কি হল? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বনে-জঙ্গলে, নির্জন জায়গায় আমাদের মতো ঘুরে বেড়ান কিছুদিন, তার পর দেখবেন সব অন্যরকম মনে হবে।"

সরদারজিও হাসলেন। বললেন, "বিশেষ করে যদি গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসে একবারটি রাত কাটাতে হয়।" পরিবেশটি যে এইরকম একটা আলোচনারই যোগ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। এক দিকে ক্ষুব্ধ নদীর জল ফুঁসছে, অন্য দিকে বনের গাছপালায় বাতাসের আলোড়ন, তার উপর মেঘলা আকাশের নীচে চার দিক থেকে এরই মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাতাসটা থম্‌থমে।

তবু, গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসের নাম শুনে অরূপের হাসি পেল। সে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, "কেন সেখানে কি হয়?" সরদারজি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "সেকি! আপনি থাকেন কোথায় যে অমন একটা সুখ্যাত জায়গার কথা জানেন না? ভাবতে পারেন সেখানে টাকা দিয়েও সরকার কখনো একটা চৌকিদার কি বেয়ারা রাখতে পারে নি। কেউ রাজি হয় নি। এটা একটা হিস্টরিকেল ফ্যাক্ট। বনের মধ্যে খাঁ-খাঁ খালি বাংলো পড়ে থাকত। নাকি সন্ধের পর জন্তু-জানোয়ারও তার ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না!"

অরূপ আবার হেসে উঠল। "তাই নাকি? অথচ আমি সেখানে পরম আরামে গতকাল রাত্রিবাস করে এলাম। চৌকিদারের আপ্যায়ন আর বাবুর্চির রান্নার তুলনা হয় না। কোত্থেকে যে ঐ ব্যাক-অফ-বিয়ন্ডে আমার জন্য মাশরুম আর অ্যাসপ্যারাগাস জোগাড় করে

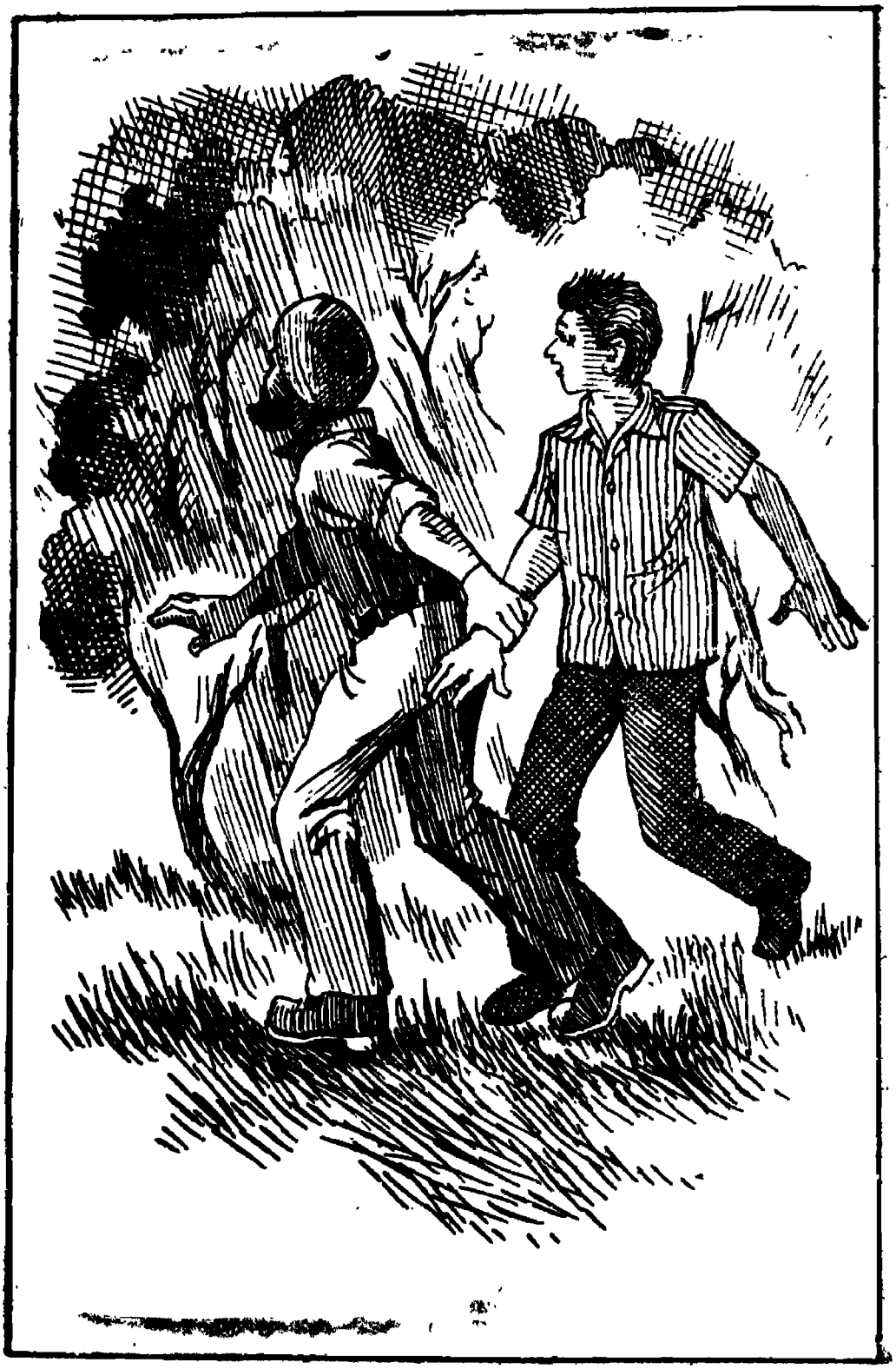

তার পরেই সব ছায়া-ছায়া হয়ে গেল।...সরদারজি অরূপকে সঙ্গে টেনে নিলেন।

খাওয়াল তা ওরাই জানে। জানেন ফেদার-বেডে রাত কাটালাম। পোসিলেনের বাথ-টাব ভরে গরম জল দিল। একটা পয়সা নিল না দুজনার একজনও। কত মন-গড়া গল্পই যে আপনারা বিশ্বাস করেন তার ঠিক নেই। তবে এ কথা সত্যি যে আমার গাইড বুকে ওটার নামেও পাশে লেখা আছে, অ্যাবাণ্ডন্‌ড ১৯০০ এ. ডি.। গাইড-বুকের লেখকও তেমনি। নিশ্চয় আপনাদের কারো কাছ থেকে ঐ তথ্য সংগ্রহ করেছিল!" বলে অরূপ খুব হাসতে লাগল। "আর তাই যদি বলেন, গাইডবাবুকে আমাদের আজকের এই আস্তানারও নাম নেই, তা জানেন? এটাই-বা এল কোত্থেকে?"

অরূপ হাসলেও বাকিরা কেউ হাসল না। তারা বরং ত্রস্ত চঞ্চল হয়ে উঠে, "ম্যানেজার! ম্যানেজার!" বলে চেঁচাতে লাগল। এলও ম্যানেজার এক মুহূর্তের জন্য, বেয়ারাটাও এল। কি যেন বলবারও চেষ্টা করল। তার পরেই সব ছায়া-ছায়া হয়ে গেল। ঘর বারান্দা কিছুই রইল না। শুধু সামনে অন্ধকার বন আর পিছনে নদীর ফোঁস্-ফোঁসানি। ওরা ধুপ্‌ধাপ্ করে যে যার গাড়িতে উঠে পড়ল। সরদারজি অরূপকে সঙ্গে টেনে নিলেন। পনেরো মাইল ফিরে গিয়ে ছোট শহরে ওরা রাত কাটিয়ে সকালে যে যার পথ দেখল। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

খালি অরূপকে জীপ ও লোকজন নিয়ে একটু বেলায় গিয়ে গাড়িটা উদ্ধার করতে হল। তখন নদীর জল কমে গেছে, পুল আর কাঁপবে না। গাড়ি সারানো হলে অরূপ পুল পার হয়ে ওদিকের পথ ধরল। তার আনা লোকগুলোর পাওনা চুকিয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, "নদীর তীরে গাছের নীচে শুকনো ফুল কেন?" তারা হেসে বলল, "গাঁয়ের লোকের কুসংস্কার মশাই। মাসে একবার এখানে বুনকিদেওর পুজো দেয়। তিনি নাকি বিপন্ন যাত্রীদের রক্ষা করেন।" অরূপ বলল, "গোলাবাড়ি সার্কিট হাউসের ব্যাপারটা কি?" তারা অবাক হয়ে বলল, "সে তো কবে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।"

অশরীরী

এখন আমি একটা সাধারণ খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও, এক বছর আগেও একটা সাংঘাতিক গোপনীয় কাজ করতাম। সে কাউকে বলা বারণ। বললে আর দেখতে হত না, প্রাণটা তো বাঁচতই না, তার ওপর সব চাইতে খারাপ কথা হল যে চাকরিটাও চলে যেত। তবে এটুকু বলতে দোষ নেই যে কাজটা ছিল খবর সংগ্রহ করা। কোথায়, কেন, কার জন্য, সে-সব তোমরাই ভেবে নিয়ো।

আমার বয়স তখন বাইশ, নামটা আর বললাম না। আমাদের পাড়ার হরিশ খুড়ো চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনেই আমার বড় সায়েব—সায়েব হলেও তিনি কুচ্‌কুচে কালো—আমাকে বলেছিলেন, "দেখ সর্বদা 'নেই' হয়ে থাকবে। তুমি যে আদৌ আছ সে কথা টের পাওয়া গেলে চলবে না। তোমার আলাদা একটা চেহারা, কিম্বা চলা ফেরা, কিম্বা কথা বলার ধরন গজালেই চাকরিটা যাবে। পানাপুকুরে এক ফোঁটা ময়লা জল হয়ে থাকবে, সমুদ্রের ধারে এক কণা বালি হবে, এক কথায় স্রেফ অশরীরী হয়ে যাবে। কথা বললে কি বলছ এটুকু বোঝা যাবে, কিন্তু আলাদা করে গলার আওয়াজ মালুম দেবে না। আর সব চাইতে বড় কথা হল যে নিজের চেহারা বলে কিছু রাখতে পাবে না, যাতে তুমি মরে গেলেও তোমাকে সনাক্ত করা না যায়। ওরকম করে তাকাচ্ছ কেন, এ কিছু শক্ত কাজ নয়, কিছু করতে হবে না, স্রেফ 'নেই' হয়ে থাকতে হবে। বেশি লেখাপড়া জানারও দরকার নেই। বলো, পারবে তো?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সার।"

বড় সায়েব বেজায় রেগে গেলেন, "ফের কথার ওপর কথা। চুপ করে থাকতেও কি শেখাতে হবে না কি? কি নাম তোমার?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

সায়েব খুব খুশি হয়ে বললেন, "খুব ভালো। মাইনে নেবার সময়

নাম লিখবে না, টিপ-সই দেবে না। নাম তো ভাঁড়ানো যায়, কিন্তু টিপ-সই দিয়ে সবাইকে চেনা যায়। দুনিয়ার কোনো দুজন লোকের একরকম আঙুলের ছাপ হয় না। ১লা তারিখে আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাবে, খাতায় লেখা হবে 'নন্টামি বাবদ দুইশো টাকা।' আচ্ছা, যেতে পার।"

আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে তিনটে আঙুল দেখালাম। বড় সায়েব হেসে, বললেন, "আচ্ছা, তিনশো টাকাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, বিপদে পড়লে আমরা বলব তোমাকে চিনি না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম শুনলাম আমার নতুন নাম ইংরিজি হরপের 'কিউ'। যেখানে যত সন্দেহজনক খবর শোনা যেত, নিজে দেখে এসে আপিসের পাশের গলিতে ভাঙা টাইপ-রাইটার ভাড়া খাটত, তাতে টাইপ করে জমা দিতে হত। তার পরের ছয় মাসে কোথায় যে না গেলাম, কি যে না দেখলাম, তার ঠিক নেই। অথচ আমাকে কেউ দেখতে পেত না। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে যেতাম। যেখানে ভিড় নেই শুধু ভাঙা দেয়াল, সেই দেয়ালে একটা দাগ হয়ে মিশে থাকতাম। একবার একটা চোরাই গুদোমে সারাদিন শ্রমিকদের একজন হয়ে গিয়ে রাশি রাশি গোপন খবর এনে দিয়েছিলাম। বড় সায়েবের মাইনে বেড়ে গেছিল। আরেকবার একটা বিদেশী মাল-জাহাজে সারাদিন একটা পিপে হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা খুঁজিয়ে পাইয়ে দিলাম। সেইজন্য খবরের কাগজে বড় সায়েবের সে কি প্রশংসা।

সে যাই হোক শেষবারের কাজটার কাছে ও-সব কিচ্ছু না। নাকি গড়িয়ার দিকে এতকাল কোনো বে-আইনি কাজ হয় নি যে সকলের সন্দেহ হল নিশ্চয় কোনো গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। তার ওপর সব বাংলা কাগজে যখন ছোট্ট একটা নোটিশ বেরুল টিপ-বোতাম পরিষদের প্রথম সভা শু-শু-৭, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে গড়িয়াতে, শুক্রবার সাতটায় গোপন সভা বসবে।

বড় সায়েবের ঘর থেকে প্রায় অদৃশ্যভাবে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাঁর পেয়ারের বেয়ারা বলল, "টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেবে না।" রুমাল জড়িয়ে হাত পাতলাম। সে এক কুচি লাল কাগজ বের করে বলল, "দু টাকা।" একটা আঙুল দেখালাম। তাকে টাকা দিয়ে টিকিট পকেটে ফেলে চলে এলাম।

শুক্রবার পাঁচটায় যখন বাসে সব চাইতে ভিড় হয়, তখন, বেছে বেছে সব চাইতে ভিড়ের বাসে উঠলাম। উঠে চারটে লোকের মধ্যিখানে এমন 'নেই' হয়ে রইলাম যে কণ্ডাক্টার টিকিট চাইল না। চাইবে কেন, আমার তো আর শরীর-টরীর নেই যে বাসের জায়গা জুড়ে থাকব।

গড়িয়াতে নেমেই একটা চায়ের দোকানে ভিড় দেখে, সটান সেখানে গেলাম। এক ভাঁড় বেজায় হালকা, বেজায় গুড়ের চা নিয়ে, তক্তার ওপর দশ পয়সা ফেলে দিলাম। সস্তা তো হবেই, শুকনো শালপাতা দিয়ে এ-সব চা বানাতে হয়, চা-পাতা দিলে আর ঐ দামে দিতে হত না।

ভাঁড় নিয়ে একটা বাঁশের খুঁটির পিছনে গুম্ হয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে হাসাহাসি হচ্ছিল ঐ শুক্রবার নিয়ে নাকি চারদিন পকেট-মার হয় নি। চট্ করে বুঝে নিলাম সভা তা হলে পকেটমারদের। একটা চিম্‌ড়ে লোক চায়ের ভাঁড় শেষ করে, সামনের বাঁশ বাগানের দিকে পা বাড়াতেই, বাকি সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল—"মশাই অমন কাজও করবেন না! ঐ বাঁশবাগানের পথ দিয়ে একটিমাত্র জায়গায় যাওয়া যায়, সেটি হল গোরে-বাড়ির ভাঙা কেল্লা, ভূতদের থান। দিনের বেলাতেও ও-পথে কেউ যায় না। কাগ-চিল, কুকুর-বেড়ালও না।"

লোকটা ভয়ে ভয়ে ইদিক-উদিক তাকিয়ে উল্টো দিকের মাঠের পথ ধরল। সকলে হাঁপ ছেড়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল। আমিও সেই সুযোগে ঐ লোকটির পিছন পিছন চললাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মাঠ ভেঙে ঘুরে সে আবার বাঁশ বাগানের ও-পারে, সেই রাস্তাটাই ধরল। আমি তার পিছনে 'নেই' হয়ে চললাম। শুকনো পাতার ওপর এতটুকু পায়ের শব্দ হল না, নইলে এতদিন কি শিখলাম!

তার পরেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। সামনেই একটা প্রকাণ্ড ভাঙা কেল্লা। সেখানে পৌঁছে পথটাও শেষ হয়ে গেছে। কেল্লার চুড়োটা শুধু দেখা যাচ্ছে, চারি দিকে এমনি ঘন বন হয়ে গেছে, যে তার বেশি কিছু ঠাওর হল না। লোকটা একটুও দাঁড়াল না, সটাং বনের মধ্যে দিয়ে সেঁদিয়ে গিয়ে, কেল্লার লোহা-বাধানো প্রকাণ্ড সদর দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশে ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। আমিও তার সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরে সেঁদিয়ে গেলাম; সে কিছু টেরই পেল না।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ, তার ও-ধারেই মস্ত ঘরে সভা বসেছে। সে কী ভিড় আর কী ভয়ঙ্কর তর্কাতর্কি। ঘরে একটা জানলা নেই, উঁচু ছাদে কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস আসে, তাও এমন আড়াল করা যে বাইরে একবিন্দু আলো যাচ্ছে না। যদিও ঘরে কয়েকটা ডে-লাইট বাতি জ্বলছে, তাতে ঘরের অন্ধকার কাটছে না, ঘুপ্‌সি ঘুপ্‌সি ভাব, একটা সোঁদা গন্ধ, পায়রার, নাকি বাদুড়ের বা অন্য বিকট কিছুর কে বলতে পারে।

সেই অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে যেতে যেতে বুঝলাম যে কেউই আলো চায় না; কারো মুখ চেনা যাচ্ছে না; সকলের একরকম কাপড়চোপড়, চেহারা, ঘাড় গুঁজে বসার আর আড়চোখে চাওয়ার অভ্যাস। এদের সঙ্গে আমার এতটুকু তফাত নেই দেখে, নিশ্চিন্তে অদৃশ্যভাবে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে। বেরুবার পথ ঐ একটি, আর সব বন্ধ, হয়তো একশো বছর খোলা হয় নি, খোলা যায়-ও না।

ফ্যাঁস্‌ফেঁসে বেড়ালে গলায় যা বলা হচ্ছিল তার কতক কতক বুঝতে পারলাম। এরা ইউনিয়ন করতে চায়, কিন্তু শত্তুরদের জ্বালায় কিছু হয়ে উঠছে না। আজকের ঐ কুখ্যাত নির্জন জায়গায় কারো অনধিকার প্রবেশের কোনো সম্ভাবনাই নেই—হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা থামের পাশের সব চাইতে অন্ধকার কোণ দিয়ে সর্‌-সর্‌ করে কেউ ছাদের অস্পষ্টতা থেকে নেমে এসে, আমার থামের ও-পাশে দাঁড়াল। আমার গা শিউরে উঠল।

বক্তা তাঁর সরু সরু হাত-পা নেড়ে বলে চললেন, "সাধারণ-নাগরিকদের অধিকার থেকে কেন আমাদের বঞ্চিত করা হবে? জনতা থেকে আমরা অভিন্ন, আলাদা করে চিনুক তো কেউ। বলুক দেখি আমরা কেমন দেখতে, কেমন গলার আওয়াজ। আমাদের—" আমার গা শিউরে উঠল। আরো গোটা দশেক ছায়া ছায়া মতো এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আবছায়াতে মিশে রইল।

বক্তা একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমাদের একটা আস্তানার দরকার ছিল, এর চাইতে ভালো আস্তানা কোথায় পাওয়া যাবে? আমরাই তো আসল অশরীরী, সকলের চোখের কাজ করি, কেউ আমাদের দেখতে পায় না। এই ছোট ইঁটের টুকরো ফেলে আজ এখানে

আমাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা—" এই অবধি বলে ইঁটটা হাতে করে তুলেছে অমনি ঘরে, একটা শোরগোল উঠল, না, না, না, না—তার পরেই মনে হল ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে পঁচিশ-ত্রিশটা ছায়ামূর্তি বক্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি অদৃশ্যভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বক্তা একটা কোঁক্ শব্দ করে বসে পড়ল।

হঠাৎ বক্তার পাশে বসা ছুঁচোমুখো একটা লোক গর্জন করে উঠল, "নটে! ভজা! কার্তিক! কি কচ্ছিসটা কি? এই সম্‌সা!" সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য ভাব ছেড়ে দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক ছোকরা খালি হাতেই মঞ্চের উপর উঠে পড়ে। ওরে বাপ্ রে! সেই ছায়ামূর্তিগুলোকে পেল্লায় পেটাতে লাগল! সেই ফাঁকে বক্তা উঠে পড়ে দে দৌড়।

আমি এমন পেট্‌নাই জন্মে দেখি নি। আগন্তুকদের আগাপাশতলা ধাঁই-ধড়াক্কা মার! তার মধ্যে কে রব তুলল, "ব্যাটারা সব পুলিশের চর, অশরীরী সেজে এয়েচেন। লাগা! লাগা! ভজা, দেখছিস কি?" ভজা বললে, "পেছলে যাচ্ছেন যে!"

শেষটা তাদের পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেই হল। সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে মঞ্চ থেকে নেমে, স্রেফ জলের স্রোতের মতো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গলে, ঘরের একটি মাত্র দরজা দিয়ে সব নিমেষের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। ধন্যি পুলিশের ট্রেনিং!

হয়তো একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখবার জন্য বোধ হয় ভিড় থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা হয়ে পড়েছিলাম। কারণ পালাতে পালাতে শেষের লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে একরকম কোল-পাঁজা করে তুলে ধরে বাইরের জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলে বলল, "চঁলে চঁল্! চঁলে চঁল্! দেঁখছিস কিঁ!" বলে একটা শ্যাওড়া গাছের ডাল বেয়ে উঠে পড়ল।

ততক্ষণে ডে-লাইট হাতে নিয়ে নটে ভজারাও দোর-গোড়ায় দেখা দিয়েছে। সেই আলোতে দেখলাম যে লোকটা গাছে চড়ছে, তার গোড়ালি দুটো সামনের দিকে। তক্ষনি গাছ-গাছড়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে মুচ্ছো গেলাম। ওরা বোধ হয় আমাকে খুঁজে পায় নি। অবিশ্যি আমি যে আছি, তাও ওরা জানত না। খুঁজবে কাকে?

বড় সাহেবের কাছে আর যাই নি। আজকাল খবরের কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করি। অবিশ্যি একেবারে 'নেই' হয়ে।

নটের বেশি সাহস। সে বলল, "কি যে বলিস, গুরু। লোকে বলে তেপান্তরের মাঠ জায়গা ভালো নয়। তোর যেমন কথা। আরে, লোকে তো এও বলে যে নটে-গুরু ছেলে ভালো নয়।" বলতেই গুরু ফিক্ করে হেসে ফেলল।

তা ছাড়া একেবারে দশ-দশটা টাকা কেই-বা দিচ্ছে কাকে? ওখানে এক রাত্তির বাস করলেই বাড়ির মালিক যদি ঐ অতগুলো টাকা দেয়, তা হলে থাকবে নাই-বা কেন? নাকি একশো বছর কেউ ওখানে রাত কাটায় নি। মনে পড়তেই গুরু অবাক হল, "হ্যাঁরে নটে, সত্যি কেউ রাত কাটায় না?"

"কেউ না, কেউ না, উদ্বাস্তুরাও তেপান্তরের মাঠ পার হয় না।"

আড়চোখে গুরুর দিকে চেয়ে নটে বলল, "কেউ কিছু বললে নাহয় পালিয়ে আসব। তাই বলে এমন একটা সৎ-কাজ করব না?"

তাই বটে। ওখানে রাত কাটাতে পারলে, বাড়িওলার বাড়ি বিক্রি হবে, কল্যাণ সঙ্ঘ সস্তায় ওটা কিনবে, কিনে ভেঙে ফেলবে, এক দঙ্গল লোক মজুরি পাবে। উদ্বাস্তুরা মিনি-মাগনায় ইঁট-কাঠগুলো পাবে, নতুন বাড়ি উঠবে, মুটে, মজুর, মিস্ত্রি, ঠিকাদার, সঙ্ঘের কম-বেশি রোজগার-পাতি হবে। যাদের কেউ নেই তারা সেখানে থাকবে, ইস্কুল হবে, কাঠের আসবাবের কারখানা হবে, বই বাঁধাইয়ের দোকান হবে, হাঘরেরা চাকরি পাবে, আর—আর নটে-গুরুও দশ টাকা পাবে।

বাড়ির মালিক কালো চশমার ভিতর দিয়ে ওদের মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে বললেন, "খারাপ জায়গা হলে থাকতে বলব কেন? আমার নিজের ঠাকুরদার বাবার তৈরি, চার দিকে আম জাম কাঁঠাল নারকোলের গাছ, তার বাইরে এক মানুষ উঁচু পাঁচিল। অথচ কেউ না থাকলে কল্যাণ সঙ্ঘের বাবুরা কিনবে না। শোনো একবার কথা! অমন ভালো বাড়ি, পুব-দক্ষিণ খোলা, আদি গঙ্গার ধারে।"

নটে বলল, "আপনি নিজে গিয়ে একরাত থেকে ওদের দেখিয়ে দিন

না কেন ? আপনার দশ টাকা বেঁচে যায়।"

মালিক বললেন, "দশ টাকা বেঁচে যায় ? দশ টাকাকে আমি নস্যির মতো মনে করি। তোরা একটি রাত কোনোরকমে থাক-না বাপ্, দশ কেন পনেরো টাকা দেব। আজ রাতেই যা।"

তাই শুনে গুরু নটের দিকে তাকাতেই মালিক বললেন, "কচুরি আলুর চাট, মিঠে গজা আর লিম্‌নেট টিপিন দেব সঙ্গে। কিন্তু সব ঘরের, দেয়ালে হরিনাম লিখে আসতে হবে। তবেই কল্যাণ সঙ্ঘ বিশ্বাস করবে অপদেবতা-টেবতার বাস নয় ও বাড়ি। বলে কিনা আমার অতি বড় বৃদ্ধ প্রপিতামহ দুই সন্ধে শিবপুজো করতেন।"

নটে-গুরু চলে গেলে, মালিকের বউ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তেরিয়া হয়ে বলল, "একটু দয়া-মায়াও নেই শরীলে ? দুধের বাছাদের দিলে পাঠিয়ে ভূতের খপ্পরে ! বলি, তুমি কি মানুষ ?"

শুনে মালিক অবাক, "কাকে দুধের বাছা বলছ ? ওদের দেখলে দুধ কেটে ছানা বেরোয়। ওরা হল গিয়ে কালীঘাটের মার্কামারা ছোঁড়া। বাড়িটা বিক্রি হয় তুমি চাও না ? ভূত ভাগাতে ওরাই পারবে। উপরন্তু টাকাও পাবে।"

এর ওপর আর কথা চলে না।

পরে গুরু বলল, "সন্ধে অবধি অপেক্ষা করে কাজ নেই, রোদ থাকতে থাকতেই চল্, তেপান্তর পেরিয়ে ওখানে গিয়ে আড্ডা গাড়ি। টিপিন তো বুড়োই দেবে বলেছে। অন্ধকারে তেপান্তরে গা ছম্-ছম্ করবে।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। পাঁচটা না বাজতেই মালিকের বউয়ের রান্নাঘর থেকে পুরোনো একটা চুপড়ি ভরে কচুরি, আলুর চাট, জিবে গজা, কাঁচকলার আচার আর থলিতে চার বোতল লেমোনেড নিয়ে, বিকেলের গড়ন্ত রোদে নটে-গুরু তেপান্তরের ওপর দিয়ে পুবমুখো হাঁটা দিল। ওদের সামনে সামনে সরু লম্বা হয়ে ওদের ছায়া দুটোও চলল। গুরু থমকে দাঁড়িয়ে নটেকে বলল, "হ্যাঁরে, সত্যি আমাদেরই ছায়া তো ? মানে আর কিছু যদি সঙ্গে—" নটে ওর কান টেনে, ঘাড়ে রদ্দা মেরে দেখিয়ে দিল ওদেরই ছায়া বটে।

খুব বড় মাঠের জায়গাই-বা হবে কোত্থেকে ঐ এলাকায়। দেখতে দেখতে ডাঙা পেরিয়ে ওপারের রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছে ওদের চক্ষুস্থির।

বলে নাকি একশো বছর কেউ বাস করে নি ও বাড়িতে। নটে-গুরু দেখল বাড়ি লোকজনে গম্‌গম্‌ করছে। আশে-পাশের যত উদ্বাস্তুদের সব চাইতে বদমাইস ছেলেমেয়েরা ঐ বাড়ির বাগানে জমায়েত হয়ে, সে কি হুল্লোড় লাগিয়েছে। সিকি কিলোমিটার দূর থেকে তাদের হৈ-চৈ, হ্যা-হ্যা হাসি, চ্যাঁ-ভ্যাঁ কান্নায় কানে তালা লাগার জোগাড়।

এ আবার কি গেরো রে বাবা। ওরা যে কাউকে ও-বাড়ির ত্রিসীমানায় এগোতে দেবে তা তো মনে হল না। আম-কাঁঠাল গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না, ফটকে চড়ে কম করে কুড়িটা ছেলেমেয়ে দোল খাচ্ছে। কেউ গেঞ্জি পরা, কেউ জাঙিয়া পরা, কেউ উদোম গায়ে কুচ্‌কুচে কালো রঙ, উস্কোখুস্কো মাথার চুল, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। কারো হাতে ঢিল, কারো হাতে চ্যালা কাঠ। এগোয় কার সাধ্যি।

নটে বলল, "থামলি যে বড়? বাড়ির ভিতর ঢুকে দ্যালে হরিনাম লিখতে হবে না? বাড়ি তো বন্ধ দেখছি, চাবি-টাবিও দেয় নি বুড়ো। নাকি কোন কালে হারিয়ে গেছে।"

ছোট-ছোট এক রাশি পাথরের কুচি ওদের গায়ে মাথায় এসে পড়ল। রাগলে গুরুর জ্ঞান থাকে না, চটে-মটে বলল, "কি হচ্ছেটা কি?" একটা টিঙটিঙে রোগা ছেলে আঙুল দিয়ে চুপড়ি দেখিয়ে বলল, "কি আছে রে ওতে?"

"আমাদের টিপিন। এই বাড়িতে রাত কাটাব, তাই টিপিন এনেছি।" অমনি বিচ্ছুগুলো বলে কি না, "এ্যাঁ। তাই নাকি? তা টিপিনটা কি জিনিস বাপ্‌?"

নটে বলল, "কচুরি, আলুর চাট, জিবেগজা, কাঁচকলার আচার।" তাই শুনে আমগাছের ওপর থেকে বিশ-পঁচিশটা একসঙ্গে বলে উঠল, "বলিস কিরে! তা আমরাও তো এখানে রাত কাটাব। দে দে আমাদেরও ভাগ দে। এই-না বলে একটার ঠ্যাং আরেকটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে বিশ হাত লম্বা একটা দুষ্টু ছেলের মালা বানিয়ে নটের হাত থেকে টিপিনের চুপড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে, ঢাকনি খুলে, এক খাবলা এ খায় তো আরেক খাবলা ও খায়, এক নিমেষে চুপড়ি খালি করে ফেলে দিয়ে, ফটক হাট করে খুলে দিয়ে বলল, "আয় বাপ্‌, ভিতরে আয়, আমাদের এত খাওয়ালি, তোরা আমাদের বন্ধু।"

নটে-গুরুর মুখে কথাটি নেই। তবে বদমাইশ দেখে ভড়কাবার

মাত্র ওরা কেউ ছিল না। ওরা ভাবছিল এই তো ভালো হল, খাবারটা গেল তার আর কি করা যাবে। এমন তো আর নয় যে না খেয়ে রাত কাটিয়ে ওদের অভ্যেস নেই। এবার এদের দিয়েই বাড়ি খুলিয়ে দেওয়ালে হরিনাম লিখিয়ে কোনো মতে রাতটাকে ভোর করতে পারলেই হয়ে যাবে। তার পর কল্যাণ সঙ্ঘ এসে উদ্বাস্তু তুলুক, কিম্বা যা-খুশি করুক নটে-গুরুর কোনো আপত্তি নেই।

ওদের ঘিরে দাঁড়াল ছেলেমেয়েগুলো, "বল্ তোদের জন্য আমরা কি করতে পারি? তোদের মতো কেউ হয় না রে, বাপ্!" নটের সাহস বেশি, সে বলল, "তবে শোন, আমরা কেন এইটি বলি। এই বাড়িতে রাত কাটালে, বাড়ির মালিক আমাদের পনেরো টাকা দেবে বলেছে!" শুনে ওদের কি হাসি। "ধেৎ! তাই কখনো দেয়। বলে দোর-গোড়ায় মরেও মুখে একমুঠো গরম ভাত কেউ দেয় না!" অমনি সকলে চাকুম্-চুকুম্ ঠোঁট চেটে বলল, "ই-ই-স্। গরম গরম ভাত কি ভালো জিনিস রে বাবা!"

ওদের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা, সব চেয়ে রোগা, সব চেয়ে কালো যে তার নাম নাকি ঢ্যাঙা। সেই ঢ্যাঙা বলল, "তা বললে তো হবে না, চাঁদ। মিছিমিছি পনেরো টাকা দেবে কেন? একসঙ্গে পনেরো টাকা তো আমরা কেউ চক্ষেও দেখি নি।" গুরু বলল, "মিছিমিছি নয়। এখানে কেউ রাত কাটাতে পারলে, কল্যাণ সঙ্ঘের বাবুরা বাড়িটা কিনবে, আশ্রম বানাবে, ইস্কুল করবে, ছুতোরের দোকান করবে, বই বাঁধাবার কারবার করবে—"

হেঁড়ে গলায় ঢ্যাঙা বলল, "তা ঐ আশ্রমে কে থাকবেটা শুনি?" "কেন যাদের কেউ নেই বাড়িঘর নেই, তারা থাকবে।" হি হি করে হেসে একদল বলে উঠল, "আমাদের তো বাড়িঘর নেই, কেউ নেই। তা হলে আমাদের মতো ছেলেমেয়েরা থাকবে বলছিস? ভাত রাঁধা হবে তাদের জন্য? রোজ রোজ ভাত, রুটি, খিচুড়ি এই-সব হবে। সদরের তালাটা খুলে দিতে পার?" দেখা গেল উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েগুলো লোক খারাপ নয়। অমনি ওরা হাঁক পাড়ল, "গিরগিটি রে, ওরে গিরগিটি, কোথা গেলি?" বলতে বলতে একটা হিল্‌হিলে রোগা ছেলে এসে বলল, "কেন, কি করতে হবে?'

"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, শুধু দেয়াল বেয়ে তিন তলার ছাদে উঠে,

চিলেকোঠার ছিকলি খুলে বাড়ির সব দোর-জানলা খুলে দে।"

ব্যস্, আর বলতে হল না। যেমন কথা তেমনি কাজ। সত্যিকার গিরগিটির মতো সর্-সর্ করে দেয়াল বেয়ে ছেলেটা ওপরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব দরজা-জানলা খুলে হাট করে দিল। শুধু তাই নয়, কোত্থেকে সব কাঠকয়লার টুকরো, ভাঙা ইঁটের কুচি এনে, এর পিঠে ও চেপে, দেখতে দেখতে প্রত্যেক ঘরের ছাদ থেকে নীচে পর্যন্ত হরিনাম লিখে ফেলল! নটে-গুরু হাঁ।

এর মধ্যে কখন সূর্য ডুবে গেল, চারি দিকে অন্ধকার নেমে এল, শুকনো কাঠের মশাল জ্বালা হল, বোধ হয় গাছ নেড়িয়ে কাঁচা আমের গুটি তুলে এনে কচ্‌কচিয়ে টিপিন খাওয়া হল আর সে কি চ্যাঁচামেচি, গান, তিড়িং-বিড়িং নাচ আর হ্যা-হ্যা হাসি। এরকম ছেলেমেয়ে বাপের কালে কখনো ওরা চোখে দেখে নি। কখন যে কোন ফাঁকে রাত কেটে ভোর হয়ে এল তা-ও ওরা টের পেল না। শেষে এক সময় ছেলে-মেয়েগুলো ওদের ঠেলা দিয়ে বলল, "ওকি! ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, আগে কথা দাও হঙ্ক-বঙ্করা সত্যি সত্যি এখানে ইস্কুল করবে, রোজ ভাত রেঁধে ছেলেদের খাওয়াবে। নইলে সব পণ্ড করে দেব। বাড়ি ছেড়ে এক চুল নড়ব না।"

নটে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ হবে, হবে। তোদের তখন এ-বাড়িতে আর হুল্লোড় করা হবে না। বলিস তো লিখে দিচ্ছি!" শুনে ওদের সে কি খিল্ খিল্ হাসি। "পড়তেই জানি না তো লিখবি কি রে! আচ্ছা, তোদের মুখের কথাতেই হবে।"

এর পর ওরা ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। জাগল অনেক বেলায়, চার দিক ভোঁ-ভোঁ, কারো টিকির দেখা নেই, গেছে সব নিশ্চয় ওদের উদ্বাস্তু কলোনিতে। দুপুরে এসে আবার নিশ্চয় আমগাছের ডাল ভাঙবে। ভাঙুক তো, ওদের কথা মালিককে বলে দরকার নেই। শেষটা যদি কলোনিতে গিয়ে মালিক গোল বাধায়।

মালিকের কাছে কল্যাণ সঙ্ঘের বাবুরাও বসেছিল, নটে-গুরুর সঙ্গে তারাও চলল বাড়ি দেখতে। দেয়ালে কেমন হরিনাম লেখা হয়েছে দেখা দরকার। তবেই প্রমাণ হবে ভূত-টুত সব বাজে কথা।

তেপান্তরের মাঠ শেষ হয়ে এসেছে, দূর থেকে হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ আসছে। গুরু নটের দিকে তাকাল। কি সাংঘাতিক! বিচ্ছুগুলো

এরই মধ্যে আবার শুরু করে দিয়েছে নাকি! কিন্তু আরেকটু কাছে যেতেই দেখা গেল তা নয়, ওদের সাড়া পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা পাখি কিচির্-মিচির্ করতে করতে নীল আকাশে উড়ে পড়ল।

আর কি বাকি রইল? কল্যাণ সংঘ বাড়ি কিনল, আশ্রমও হল, একপাল হাঘরে ছেলেমেয়ের থাকবার জায়গা হল, রোজ বড়-বড় হাঁড়ায় তাদের জন্য ভাত রান্না হয়। বাড়ির মালিক খুশি হয়ে নটে-গুরুকে পনেরো টাকা দিয়েছিল! কথাটা জানাজানিও হয়েছিল। নানা লোকে নানা কথা বলেছিল। অন্য লোক টাকা পেলে ওরকম তো বলবেই। খালি গুরুর বাউণ্ডুলে ছোট্দাদু একটু অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। ষাট বছর আগেও ঐ বাড়ি খালি পড়ে থাকত। উনি নাকি একবার পিট্টির ভয়ে সন্ধেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ঐ বাড়িতে গা-ঢাকার তালে ছিলেন। তা বিচ্ছুগুলো ওঁকে ঢুকতেই দেয় নি। মহা বদমাইস্ ছেলেগুলো, বিশেষ করে চ্যাঙা বলে একটা লম্বা কালো ছেলে আর গিরগিটি বলে একটা হিল্হিলে ছোকরা, সে ব্যাটা সটাং দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করেছিল।

তবে ওরা আর কখনো আসে নি।

হানাবাড়ি

হানাবাড়ির দোতলার মাকড়সার জালে ঘেরা জানলার ভাঙা পাল্লার ফাঁক দিয়ে পরেশবাবু অনিমেষের আগমন লক্ষ্য করলেন। উত্তর রাধাপুর ইউনিয়ন ক্লাবের আরো তিনজন সভ্য, অর্থাৎ স্বয়ং দারোগাবাবু। বড়বাবুর বড় শালা বটুকবাবু আর হেডমাস্টার ওর সঙ্গে এসেছিলেন। এইরকমই কথা হয়েছিল; বাইরের তিনজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি সাক্ষী থাকবেন। তাঁরাই অনিমেষকে পৌঁছে দেবেন, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার পর রাত আটটায়। আবার ভোর পাঁচটায় তাঁরাই এসে তাকে নিয়ে যাবেন। তবে ভূতের বাড়ির ভিতরে কেউ পা দেবেন না সকালের আগে।

উত্তর রাধাপুর ইউনিয়ন ক্লাবের চৌকিদার নকুল—তাকে চৌকিদারও

বলা যায়, ফরাসও বলা যায়, চাকরও বলা যায়, আবার পেয়ারের গুরুঠাকুরও বলা যায়, ক্লাবের গোড়া পত্তন থেকে আছে বলে আজকাল তার বড়ই বাড় বেড়ে গেছে, বর্মা থেকে এসে অবধি পরেশবাবু এটা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আর পাঁচজন গণ্য-মান্য সভ্যরা যখন কিছু বলেন তো না-ই, বরং তার বে-আদবি দেখে বেশ মজাই পান, তখন নবাগত পরেশবাবুর কিছু বলা শোভা পায় না, এই ভেবে তিনিও কিছু বলেন না। অনিমেষ হল গিয়ে ঐ নকুলের ঘোড়া।

অবিশ্যি অনিমেষ কিছু সত্যিকার ঘোড়া নয়, বরং অনেকেরই মতে সে একজন সুস্থ স্বাস্থ্যবান সুশিক্ষিত সুদর্শন ল' পরীক্ষা পাশ করা যুবক, সবে মুন্সেফ হয়েছে, এবং সব চেয়ে বড় কথা সে হল গিয়ে নকুলের স্বর্গগত পুরোনো মুনিবের একমাত্র ছেলে। নকুলের চোখে সে একটি ভগবান বিশেষ, তার কোনো দোষ সে দেখতে পায় না। সে যাক্ গে, এ বিষয়ে বেশি বলতে গেলে লোকে ভাবতে পারে পরেশবাবু অনিমেষকে হিংসে করেন? মোট কথা অনিমেষকে নিয়েই যখন বাজি আর নকুল যখন তার সব চেয়ে বড় সাপর্টার, তখন তাকে নকুলের ঘোড়া বললে দোষ হয় না।

তা ছাড়া, পরেশবাবুর পঞ্চান্ন বছর বয়স, ব্যবসা করে বর্মায় বেশ নামডাক পয়সাকড়ি করেছিলেন, এখন ভাগ্যের দোষে সে-সবই প্রায় খুইয়েছেন, কিন্তু তাই বলে অনিমেষের মতো একটা চ্যাংড়া ছোকরাকে তিনি হিংসে করতে যাবেন কোন দুঃখে? আসল কথা হল ঐ নকুলটির আর অনিমেষের দুইজনেরই একটু শিক্ষা দরকার হয়ে পড়েছে। ক্লাবের আর সকলেই যখন অনিমেষের রূপ-গুণ দেখে অজ্ঞান আর নকুলের ভাঁড়ামিতে আহ্লাদে আটখানা, তখন পরেশবাবুকেই সেই শিক্ষাটুকু দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। হাজার হোক, অনিমেষের বাবা অজানেশ তো একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পরেশবাবুরই বন্ধু ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে বর্মা গেলেন, ব্যবসা শুরু করলেন, পরেশবাবু ফেঁপে উঠলেন। আর অজানেশ দেউলে হলেন, শেষটা পরেশবাবু জলের দরে তাঁর ব্যবসাটি কিনে নিলেন—এর জন্যে পরেশবাবুর নিন্দা না করে বরং তারিফই করতে হয়। অথচ নকুলটা এমন ভাব দেখায় যেন পরেশ-বাবুই অজানেশের ব্যবসাটি লাটে তুলে দিয়েছিলেন। আরে বাপু, ব্যবসা করতে গেলে সবাই অমন অল্প-বিস্তর চালাকি করে থাকে; তাই

করতে হয়, নইলে অজ্ঞানেশের মতো ব্যবসা তুলে দিতে হয়। সেই যে দেউলে হয়ে অজ্ঞানেশ দেশে ফিরে গেল আর পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি, মরলও অকালে।

একরকম বর্মীই হয়ে গেছিলেন পরেশবাবু, তার পর অদৃষ্টের ফেরে প্রায় খালি হাতে দেশে ফিরেছেন। মজার কথা হল যে, হানাবাড়িটা আসলে অনিমেষদেরই পৈতৃক বাড়ি, পঁয়ত্রিশ বছর খালি পড়েছিল, নাকি ভূতের উপদ্রব! কেউ বাস করতে তো রাজি নয়ই, এমন-কি, সন্ধের পর ঐ দিকে যেতেও চায় না। অনিমেষ মামাবাড়িতে মানুষ, পৈতৃক বাড়ির ধার ধারে না, ইদানিং এখানে পোস্টেড হয়েছে, কোয়ার্টারে থাকে, ক্লাবে আড্ডা দেয়। অনিমেষের সেইখানেই পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ। আগে বাপের কাছে তাঁর নাম শুনেছিল বটে, কিন্তু দেখে নি কখনো। পরেশবাবু প্রায় ত্রিশ বছর পরে বর্মা থেকে ফিরে মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে উঠেছেন। এইখানেই ছোটোখাটো একটা ব্যবসা ফাঁদবেন বলে কিছু মূলধনের চেষ্টায় আছেন। এমন সময় এই সুযোগটি, বলতে গেলে ভগবানই জুটিয়ে দিলেন। অনিমেষ বলে বসল যে ভূতে বিশ্বাস করে না, ও বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আছে এ কথাও সে বিশ্বাস করে না, এমন-কি, কেউ যদি বাজি ধরে তো ভূতের বাড়িতে একলা এক রাত কাটিয়ে সে এ কথা প্রমাণ করে দিতেও প্রস্তুত।

বাস্, ক্লাবে যেমন কথায় কথা বেড়ে থাকে, দেখতে দেখতে পরেশবাবুর সঙ্গে অনিমেষের পাঁচশো টাকা বাজি ধরা হয়ে গেল।

অনিমেষ ভূতে বিশ্বাস না করলেও, দেখা গেল যে নকুল যথেষ্ট করে। সে হাঁউমাউ করে বলে উঠল, "ফট্ করে যে বাজি ধরছ অনিদাদা আছে তোমার পাঁচশো টাকা?" ক্লাবের বাবুরা অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে আমরাই নাহয় ধার দেব, তুই ভাবিস নে নকুল।" অনিমেষ বললে, "তুমিও যেমন নকুলদা, আগে বাজি হারি, তবে তো টাকা দেবার কথা উঠবে। বিছানা বালিশ নিয়ে গিয়ে কেমন দিব্যি নিশ্চিন্তে সেখানে রাত কাটিয়ে, পরেশকাকার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা বাগাই, দেখো!"

নকুল তবুও ক্যাঁও ম্যাও করতে থাকে—"আজ তোমার মা বেঁচে থাকলে, ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে দিত তোমাকে? শেষটা যদি সত্যিই ভূতে ধরে? একগাল হেসে অনিমেষ বললে—"দূ! দূ! কি যে বল! ভূতটি নাকি আমার বাবার পিসি, তার বিয়ের রাতের লাল

চেলি আর এক গা গয়না পরে দেখা দেয়; পরদিন, ভোর থেকেই তাকে আর কেউ নাকি দেখে নি। নতুন বরটিও অমনি দানের জিনিস, পণের টাকা নিয়ে পাশের গাঁয়ে আবার বিয়ে করেছিল। সাক্ষাৎ বাপের পিসি, সে কি আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারে নাকি যে, তাকে দেখে ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পাঁচশো টাকা বাজি হারব। তোমার কোনো ভয় নেই। অন্য ভয় আমারই বরং একটু আছে; ও পরেশকাকা, আছে তো আপনার পাঁচশো টাকা?—শেষটা মিনি-মাগনায় আজকে ভূতের বাড়িতে রাত্রিবাস করাবেন না তো?"

তাই শুনে ক্লাবের সকলের কি হাসি, যেন ভারি মজার কথা বলেছে। ঝপাং করে টেবিলের উপর মনিব্যাগ ফেলে দিয়েছিলেন পরেশবাবু। পাঁচশোই আছে তাঁর, তা ছাড়া সামান্য কিছু জমানো টাকা। বলেছিলেন—"তোমার পাঁচশো পেলেই, আমার ব্যবসাটি শুরু করে দেব। আপনাদের সব হালখাতার নেমন্তন্ন রইল, তুমিও যেয়ো অনিমেষ।"

পরেশবাবুও ভূত-টুত মানেন না। তবু বাছাধনকে যে পৈতৃক বাড়িতে রাত কাটাতে হচ্ছে না, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহটুকু নেই, তার কারণ হল অতি উত্তম ফরমায়েসি ভূতের ব্যবস্থা হয়েছে। বর্মার সেকালের গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটারের বটকেষ্ট যেমন খাসা ভূত হতে পারে, সত্যিকারের ভূত বলে যদি কিছু থাকত তো তারাও অত ভালো হত না। এমন মেয়ের সাজ করতে পারে বটকেষ্ট যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না। আজ রাতে সে লাল চেলি পরবে, গা ভরা গিলটি গয়না পরবে, গা থেকে অদ্ভুত আলো বেরুবে, আবার দপ্ করে নিবে যাবে, অমনি ভূত অদৃশ্য হয়ে যাবে। হরেকরকম ভুতুড়ে আওয়াজও দেবে বটকেষ্ট; তার কতক কতক শুনেও এসেছেন পরেশবাবু। বাবাঃ, দিন দুপুরে কেষ্টনগরের এক হাট লোকের মাঝখানেও তাই শুনে পিলে চমকে গেছিল। সে কথা মনে করে এখন আবছা অন্ধকারে নিশ্চিন্ত মনে অনিমেষকে হানাবাড়িতে ঢুকতে দেখে, অনেক কষ্টে পরেশবাবু হাসি চাপলেন।

এ বাড়িতে যে ভূত-টুত নেই, সব যে গাঁয়ের দুষ্টু লোকের কল্পনা, সেটুকু জানতে পরেশবাবুর বাকি ছিল না, যেহেতু বর্মা থেকে ফিরেই, প্রথম রাতটি কিছু না জেনেশুনে, এই বাড়িতেই নিশ্চিন্ত না হলেও,

একেবারে নিবিঘ্নে ঘুমিয়ে কাটিয়ে ছিলেন। তার পর সকালে মাসতুতো ভাইটিকে খুঁজে বের করেছিলেন। অবিশ্যি ভূত না থাকলেও, বাড়িটা যে যথেষ্ট ভুতুড়ে সে কথা মানতে হবে। ছাদ থেকে লম্বা লম্বা ঝুল ঝোলে; আচমকা যখন নরম একটি ছোঁয়া লেগে যায় কপালে, আঁতকে উঠতে হয়। দরজা জানলার কব্জা ভাঙা, সে যে কতরকম ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ শব্দ হয় সে ভাবা যায় না। তার ওপর ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে খালি বাড়িতে হাওয়া ঢুকে কিরকম একটা হু হু শব্দ করে যে শুনলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, ভূতে অবিশ্বাস এবং ফুঙ্গির দেওয়া ভূতের মাদুলি না থাকলে, ভূতের কথা না জেনেও, পরেশবাবু ও বাড়ি রাত কাটাতে পারতেন কি না সন্দেহ।

আজকে এ-সবের উপরে বটকেষ্ট ভূত তো আছেই। তাকে পই-পই করে বলে দেওয়া হয়েছে যেন লোমশ হাত দুটোকে চেলি দিয়ে ঢেকে রাখে। মুখে সে এমনি মেক্-আপ দেবে যে কারো বাবার সাধ্যি নেই নকল ভূত বলে টের পায়।

অনিমেষ সঙ্গে করে বিছানা এনেছে, তা ছাড়া একটা গামছা না কি যেন এনেছে, মাটিতে বিছানা পাততে হবে, বাবু তাই মেজেটাকে বোধ করি ঝেড়ে-ঝুড়ে নেবেন। একটা টর্চও এনেছে নিশ্চয়, মোমবাতি, দেশলাইও এনেছে হয়তো। সেটি জেলে শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত সব শব্দ শুনবে ব্যাটাচ্ছেলে, আর গায়ের রক্ত হিম হয়ে উঠতে থাকবে। তার পর আড়ালে দাঁড়িয়ে বটকেষ্ট একটা বেলুন থেকে কি একটা গ্যাস্ ছাড়বে। অমনি নাকি মোমবাতির আলো বেড়ে এক হাত উঁচু হয়ে উঠবে। চমকে ব্যাটা উঠে বসবে, আর সেইরকম হু-হু শব্দ করতে করতে পিসির ভূত দেখা দেবে। তার পর মোমবাতিটা যেই কমতে কমতে একেবারে নিবে যাবে, পিসির ভূতও অদৃশ্য হবে আর অনিমেষ-বীরও চোঁ-চাঁ দৌড় লাগাবে। উঃ, ভেবেও কি সুখ। এই সুখ ভোগ করবার জন্যেও অনিমেষ যাতে কোনো চালাকি না করে, তাই পরেশবাবু এখানে আজ লুকিয়ে বসে আছেন। সিঁড়িতে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে চমকে ফিরে আঁতকে উঠলেন পরেশবাবু। কি চমৎকার ভূত সেজেছে বটকেষ্ট। আরেকটু হলে তিনি নিজেই নিজের ভাড়া করা ভূত দেখে, মাদুলি সঙ্গে থকো সত্ত্বেও নির্ঘাৎ মূর্চ্ছা যেতেন। সড়্ সড়্ করে নিঃশব্দে লাল চেলি পরা মূর্তিটা সিঁড়ি দিয়ে নেবে গিয়ে নীচের হল

তার পর দু হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে পরেশবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ঘরে ঢুকল। সেইখানে অনিমেষ শুয়ে আছে। উত্তেজনায় পরেশবাবুর দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড়। বাবা, কি ওস্তাদ ঐ বটকেষ্টটা এমনি নিঃশব্দে কাজ করে যে কখন যে এসে পৌঁছল এতটুকু টের পান নি পরেশবাবু। এমন-কি, মনে মনে একটা ভয়ই হচ্ছিল যদি কেষ্টনগর থেকে এতটা পথ আসতে গিয়ে, কোনো দুর্ঘটনা হয়ে থাকে! যাক, এবার সব ভাবনা ঘুচল, কাল হাতে-নাতে পাঁচশোটি টাকা পাওয়া যাবে।

নৈঃশব্দ্য ভেদ করে বিশ্রী একটা হু-হু শব্দ কানে এল; গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল পরেশবাবুর। উঃ, কি বাড়াবাড়িটাই করতে পারে বটকেষ্ট পঁচিশ টাকার জন্যে। অনিমেষের কোনো সাড়া-শব্দ নেই? কেন? যদি—যদি ভয়ে হার্টফেল্ করে মরেই যায়? এমন তো শোনা গেছে কত সময়। পরেশবাবুর বুকটা এতটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগল! তা হলে তো এত কষ্ট, এত খরচ করেও সব পণ্ড হয়ে যাবে। টাকা দেবে কে?

হঠাৎ চেয়ে দেখেন দোর গোড়ায় বটকেষ্ট, অর্থাৎ লাল চেলি পরা মূর্তিটি, তার গা থেকে কেমন একটা সাদা আলো বেরুচ্ছে, ফ্রস্‌ফরাস্ না কি যেন। এইরকমই কথা ছিল, অনিমেষকে ভাগিয়ে বটকেষ্ট উপরে এসে পরেশবাবুকে ডেকে নিয়ে যাবে, যাতে অনিমেষের পলায়নের আরেকজন বাইরের সাক্ষীও থাকে। কিন্তু বটকেষ্ট অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? গলা খাঁকরে পরেশবাবু বললেন—"কি, বটকেষ্ট? কথা বলছ না কেন?"

মূর্তিটি হেসে উঠল, খিল্ খিল্ করে মেয়েলি সুরে; তার পর দুহাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে পরেশবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পরেশবাবুর সর্বাঙ্গ বেয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা ঘাম ঝরতে লাগল। সেই সাদা আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন এ তো বটকেষ্ট নয়, এর হাতে ঘন কালো লোম নেই, যেন মাখনের তৈরি ফরসা সুন্দর ছোট্ট দুখানি হাত।

অজ্ঞান হয়ে পড়তে পড়তে সামলিয়ে নিলেন পরেশবাবু, গলা দিয়ে স্বর বেরুল না, হঠাৎ ফিরে দুড়্‌দাড়্ করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বন-বাদাড় ভেঙে দূরে যেখানে গাঁয়ের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে সেদিকে ছুটলেন।

পরদিনটি রবিবার। সকালে গাঁসুদ্ধু লোকের মুখে শোনা গেল

পরেশবাবু বাজি হেরে রাতারাতি কোথায় সরে পড়েছেন। তাঁর মাসতুতো ভাই কেদার মিত্তির নাকি চার দিকে তাঁর খোঁজ করছে শুনে ক্লাবে মহা হৈ চৈ, এদিকের ফিগ্টির ফর্দ তৈরি ; এগারোটায় সকলের ক্লাবে জমায়েত হবার কথা : নকুলের সেকি রাগ। "এ কিরকম ভদ্রলোক! বাজি হেরে ফাঁকি দিয়ে পালানো! না, ওনাকে ছাড়া হবে না, যেখান থেকে হোক, চ্যাংদোলা করে ধরে আনা হবে। কি অনিদাদা, তুমি কেন চুপ, লোকসান তো তোমারই।"

অনিমেষ একটু হেসে বললে—"না, নকুলদা, সত্যি কি আর ওঁর টাকা নিতাম আমি, ঐটুকুই ওঁর সম্বল। শুধু একটু জব্দ করার ইচ্ছে ছিল। তা উনি করেছিলেন কি, গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটারের বটকেষ্ট কাকাকে ভূত সাজিয়ে আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে টাকা দিয়ে এসেছিলেন। বটকেষ্টকাকা বাবাকে বড় ভালোবাসতেন, উঠিপড়ি করে কেষ্টনগর থেকে ছুটতে ছুটতে আমাকে খবরটা দিয়ে গেলেন। তা ছাড়া এও বলে গেলেন যে, রাত-দুপুরে ভূতের বাড়িতে একা যাবার ওঁর সাহস নেই, যদিও পরেশকাকাও সেখানে থাকবেন, তবু বটকেষ্টকাকা সাদুকাকিকেও সঙ্গে নেবেন। টাকা নিয়েছেন, কাজেই উনি আমাকে নিশ্চয়ই ভয় দেখাবেন ; সাদুকাকিও সেই সময়টি নষ্ট না করে ঠিক একই রকম সাজ করে পরেশকাকাকে ভয় দেখাবেন। বিনি পয়সায়, যাতে কেউ না বলতে পারে আমিও ভূত ভাড়া করে চালাকি করছি। দারুণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন নাকি পরেশকাকা, সাদুকাকির কাছে শুনলাম। কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে কোনো বিপদে পড়েন নি তো? নিখোঁজ কেন?"

কেদার মিত্তির কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে—"বিপদে পড়লে তার সুটকেস আর আমার নতুন আলোয়ান নিয়ে অদৃশ্য হতেন না। তুমি নিশ্চিন্ত হও। সে কলকাতায়, ভূতের হাত থেকেও বেঁচেছে, পাঁচশো টাকাও বেঁচেছে। এখন ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমাকে কি খাওয়াবে, খাওয়াও।